KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : কবিতাভবন 202 রাসবিহারী এভিনিউ, কল-29
Collection : KLMLGK	Publisher : বুদ্ধদেব বসু
Title : কবিতা (KAVITA)	Size : 5·5"x8·5"
Vol. & Number : 18/4 20/1 20/2 20/4 21/1	Year of Publication : Aug 1954 Sep 1955 Dec 1955 June 1956 Sep 1956
	Condition : Brittle / Good
Editor : বুদ্ধদেব বসু	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কবিতা

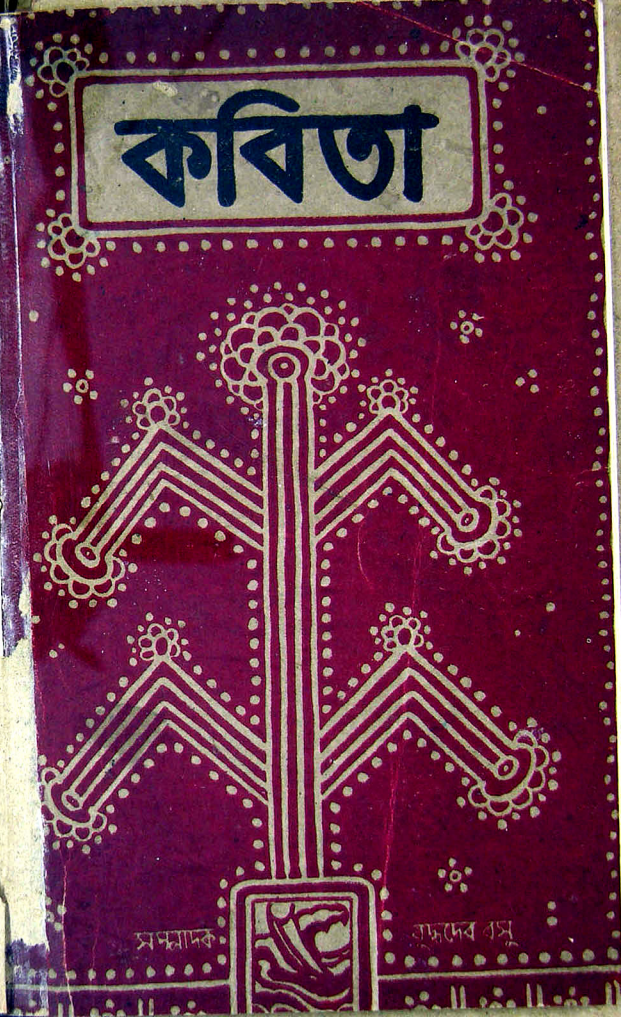

সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু

কবিতা
আশ্বিন ১৩৬২
বিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
ক্রমিক সংখ্যা ৮৩

সম্পাদকীয়

'কবিতা'র কুড়ি বছর আরম্ভ হ'লো। হওয়া উচিত ছিলো একুশ বছর; কিন্তু—পুরোনো পাঠকদের স্মরণে থাকতে পারে—১৩৫৭ ও ৫৮-তে পত্রিকার প্রকাশ এতই অনিয়মিত ও অনিশ্চিত হ'য়ে উঠেছিলো যে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে কাগজে-কলমে পুরো একটা বছর আমরা ছেড়ে দিয়েছিলাম। তা কুড়ি হোক বা একুশ হোক, কোনো কবিতা-পত্রিকার পক্ষে আমরা বড়ো দীর্ঘকাল টিঁকে আছি, এ-কথা এখন মানতেই হয়। হয়তো অসংগতরকম দীর্ঘকাল। পাঁচ, সাত, দশ বছরের উজ্জ্বল জীবনের পরে আমরা যদি অবসিত হতুম, সেইটাই যেন স্বাভাবিক হ'তো, সাহিত্যের উত্তম ঐতিহ্যের অনুগামী। ক্লান্তি নামেনি তা নয়, অন্ধকার প্রহর আমরা জেনেছি; কিন্তু সেই মুমূর্ষুতা অতিক্রম করার প্রেরণা কখনো হারিয়ে যায়নি, তা যেন এই পত্রিকারই প্রবাহের মধ্যে নিহিত ছিলো; তারই আদেশ পালন ক'রে চলেছি আমরা। হোক পত্রিকা, হোক মানুষ, তার সত্যিকার আয়ুষ্কাল ততক্ষণই, যতক্ষণ নিজেকে সে প্রয়োজনীয় এবং সার্থক ব'লে অনুভব করে। অন্যেরা যা বলে বলুক, নিজেকে সার্থক ব'লে অনুভব করাই আসল কথা; তারই নাম জীবন।

* * * *

এই সার্থকতাবোধ কোথা থেকে আসে? আসে মূল্যবোধ থেকে। কোথায় আমরা মূল্য দিয়ে থাকি, আমাদের সকল ক্রিয়াকলাপ তারই উপর নির্ভর করে। 'কবিতা'র মতো পত্রিকা অর্থাগমের উপায় নয়, সর্বসাধারণের সামনে বিপুলভাবে উপস্থিত হবারও পথ নয় এটি: এই কাজের প্রকৃতি অনেকটাই ব্যক্তিগত। এ যদি বেড়ে উঠে থাকে এবং অন্তর্ধানের সম্ভবপরতার প্রতিবাদ ক'রে থাকে, তার কারণ এর অন্য কোনো আকর্ষণ—মনের দিক থেকে, ভাবের দিক থেকে কোনো

আকর্ষণ। 'আদর্শ' কথাটা বড্ড কড়া, আঁটোসাঁটো, গম্ভীর ; 'কবিতা' বের করার সময়, বা পরবর্তী কালে, আমাদের সামনে কোনো স্পষ্ট আদর্শ ছিলো, এ-কথা বললে অতিরঞ্জন হবে। যেটা ছিলো, সেটা মনের একটা ইচ্ছে মাত্র, খুব বড়ো কোনো ইচ্ছেও নয় ;—কবিতার জন্য পরিচ্ছন্ন আর নিভৃত একটু স্থান ক'রে দেবো, যাতে তাকে ক্রমশপ্রকাশ্য উপন্যাসের পদপ্রান্তে বসতে না হয়, কুণ্ঠিত হ'য়ে থাকতে না হয় রঙ-বেরঙের পসরার মধ্যে, অনেক বেশি গলার-জোর-ওলা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে—যাতে তারই জন্য নির্দিষ্ট খেয়ায় সধর্মীর সঙ্গে সসম্মানে সে পৌঁছতে পারে স্বল্পসংখ্যক সুনির্বাচিত পাঠকের কাছে—এইটুকু মাত্র ইচ্ছে করেছিলাম। 'সসম্মানে' এবং 'সুনির্বাচিত', এই বিশেষণ দুটি লক্ষ্যণীয় : যে-পত্রিকায় কবিতা আর সাহিত্যের আলোচনা ভিন্ন আর-কিছু থাকে না, এবং এসপ্লানেডের স্টলওলার মতে মূল্য যার অসম্ভবরকম বেশি, সেই পত্রিকা যে-ক'জনই কিনবেন, তাঁদের প্রত্যেককেই কাব্যকলার প্রকৃত অনুরাগী ব'লে ধ'রে নেয়া যায়। অতএব এতে প্রকাশিত কবিরা অপাত্রে আত্মনিবেদনের লজ্জা থেকে বাঁচেন, এবং সম্পাদকের পক্ষেও সেটাই সবচেয়ে বড়ো তৃপ্তির কথা। অর্থাৎ, আমরা কবিতা নামক বিষয়টাকে জরুরি ব'লে মনে করি ; মনে করি, ওতে সমগ্রভাবে মানবসভ্যতার অত্যন্ত কিছু এসে যায়—যদিও সেটা কেমন ক'রে ঘ'টে থাকে, 'পুনশ্চ' 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' বা 'চোরাবালি' নামক কাব্যগ্রন্থ লেখা না-হ'লে—যাকে আমরা 'দেশ' ব'লে থাকি সেই দৈনিকপত্র-পরিবেশিত জনগণের কোথায় কোন ক্ষতি হ'তো, সেটা বুঝিয়ে দেবার স্পর্ধা আমরা রাখি না। কিন্তু যেমন আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আমাদের দেহের অভ্যন্তরে অনেক যন্ত্র, অনেক গ্রন্থি নিরন্তর কাজ ক'রে যাচ্ছে, আমরা তা কখনো জানতে পারি না, কিন্তু কোথাও কোনো প্রক্রিয়া ক্ষুণ্ণ হ'লেই পীড়িত হ'য়ে পড়ি—সভ্যতার উপর কবিতার বা শিল্পকলার প্রভাবও সেই রকম। এই পত্রিকার প্রথম থেকেই, কবিতার এই আদিমূল্য আমরা স্বীকার ক'রে নিয়েছি, এবং সেই সঙ্গে, আলোচনা এবং উদাহরণ দ্বারা, এটাও স্পষ্ট ক'রে তুলতে চেয়েছি যে পদ্যের আকারে মিলিয়ে লেখা রচনামাত্রকেই কবিতা বলে না।

* * * *

আজ ভেবে দেখলে মনে হয়, 'কবিতা' আরম্ভ হয়েছিলো কবিতার পত্রিকা-রূপে নয়, কবিদের পত্রিকা-রূপে। অর্থাৎ, প্রতি সংখ্যায় কিছু কবিতা—এমনকি, কিছু ভালো কবিতা ছাপা হবে, আমাদের লক্ষ্য ঠিক এই রকম ছিলো না ; সমসাময়িক সৎকাব্যের সমগ্র ধারাটিকে আমরা এর মধ্যে সংহত করতে চেয়েছিলাম। একটি সৌভাগ্যময় সমাপতন আমাদের সহায় ছিলো ; তিরিশের বছরগুলিতে যে-সব কবিরা নতুন দৃষ্টি ও নতুন সুর নিয়ে এসেছিলেন, যাঁদের ক্রিয়াকলাপ, কোনো সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কাব্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তাঁদেরই বাহন এবং প্রচারক-রূপে আমাদের যাত্রারম্ভ। তারপর এই কুড়ি বছরে আরো অনেক তরুণতর সঙ্গ পেয়েছি, ; পেরিয়ে গেছি বিতর্ক, সহ্য করেছি বিচ্ছেদ, দেখেছি খ্যাতির উত্থান ও পতন, তুচ্ছ এবং মহৎ পরিণাম। আমাদের প্রথম সহযাত্রীর মধ্যে জীবনানন্দ দাশ মৃত, কেউ-কেউ মৌন, কেউ বা দূরে স'রে গেছেন। কিন্তু—'কবিতা'র সূচীপত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যাবে—তাঁদেরই অনেকের বসন্তের দিনে যেমন আমরা এককালে ফুল তুলেছি, তেমনি তাঁদের হেমন্ত ঋতুর ফল কুড়োতেও আজ আমরা যত্নবান। এই নিরবচ্ছিন্ন সহযোগের জন্য ভাগ্যের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং যাঁরা আপাতত মৌন, আমরা তাঁদেরও প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশী।

* * * *

কিন্তু এই কয়েকজন কবি—আজকের দিনে পাঠকমাত্রেই যাঁদের সঙ্গে পরিচিত—তাঁদের বাইরে আরো অসংখ্য লেখকের রচনা আমরা প্রকাশ করেছি—কখনো-কখনো এমন রচনা, যা নিজের মধ্যে সার্থক ও সম্পূর্ণ, উপরন্তু সম্ভাবনার বাহন। বস্তুত, 'কবিতা'র পৃষ্ঠা থেকে অখ্যাত লেখকদের কবিতা বেছে নিয়ে একটি মনোহর সংকলনগ্রন্থ রচনা করা অসম্ভব নয় : কয়েকটি, এমনকি হয়তো একটিমাত্র ভালো কবিতা লিখে অনেকেই এক নিরভিজ্ঞান কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেছেন—তারপরে আর তাঁদের বিষয়ে কিছুই শুনিনি বা জানতে পারিনি। কী হ'লো তাঁদের, কেন আর লিখলেন না, কোন দারিদ্র্য অথবা সাফল্য, উচ্চাশা অথবা হতাশার চাপে ঠোঁটের উপর ভাষা ম'রে গেলো তাঁদের, না কি ঐটুকুর বেশি বরাদ্দ নিয়েই জন্মাননি তাঁরা—

এই সব দূরকল্পনা মনোবিজ্ঞানীর প্রদেশভুক্ত, সাহিত্যিকের নয়। কিন্তু এই ঐকাহিক লেখকদের—যাঁরা অন্তত একবারও ডাক শুনতে পেয়েছিলেন—তাঁদেরও আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে, বেদনার সঙ্গে স্মরণ করি : যুগে-যুগে এই ক্ষণকালীনের যে-স্রোত ব'য়ে চলে সমসাময়িকের সংলগ্নতায় তার প্রয়োজন আছে, এবং পরিশ্রমী ও বিবেকবান উত্তরকালের ভাণ্ডারে যে এ থেকে দু-একটি রত্ন চয়িত হ'তে না পারে তাও নয়। সার্থকতা গভীরতম অর্থে দৈবাধীন ; আমাদের কাজ প্রচেষ্টার উপর দৃষ্টি রাখা।

* * * *

নতুন কবিরও অনটন ঘটেনি। সাহিত্যিক হিশেবে কুড়ি বছরের মধ্যে দুই বা তিন পুরুষ বেড়ে উঠতে পারে ; আজকের দিনে যাঁরা পঞ্চাশ-প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত, এবং যাঁরা কুড়ির কিনারায় কম্পমান—তাঁদের, এবং তাঁদের মধ্যবর্তী সকলেরই জন্য আমাদের আমন্ত্রণ অবারিত রেখেছি। আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করি কয়েকজন তরুণ কবির যাথার্থ্য—হয়তো তাঁরাও আক্ষরিক অর্থে আর তরুণ নন, কিন্তু কনিষ্ঠরাও ইতিমধ্যে তাঁদের কাব্যচর্চার কিছু প্রমাণ দিয়েছেন। বাংলাদেশে কবিতার প্রচার, মনে হয়, বিবর্ধমান ; এই বিষয়টিতে প্রকাশকদের মধ্যে যে-সন্তর্গভিণীর অরুচি ছিলো তাও এখন অবসিত বললে ভুল হয় না। তার একটা বড়ো প্রমাণ এই যে গত দু-তিন বছরের মধ্যে তরুণ কবিদের অন্তত পঁচিশখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হ'তে পেরেছে, তার অনেকগুলো আবার একেবারে প্রথম বই। এই সব বইয়ের পাতা উল্টিয়ে ধারণা হয় যে বাংলা কবিতার পরবর্তী যুগান্তর এখনো কালের গর্ভে নিহিত। এটা নিরাশার কথা নয়, কেননা সৃষ্টিমাত্রেই সময়-সাপেক্ষ, বিশেষত শিল্পকলার বিবর্তনে কালের দুর্জ্ঞেয় প্রভাব অমোঘভাবে কাজ ক'রে থাকে। আপাতত কোনো-কোনো নতুন কবি কলাকৌশলে নৈপুণ্যের পরিচয় দিচ্ছেন, বৈচিত্র্যেরও আস্বাদ পাই মাঝে-মাঝে, বিরল কোনো মুহূর্তে একটি সুন্দর, উদ্ধৃতিযোগ্য কবিতা। যেটা পাওয়া যায় না সেটা কোনো স্পর্শসহ বস্তু, পাওয়া যায় না পংক্তির ফাঁকে-ফাঁকে না-বলা এবং অনির্বচনীয় সংবাদ—কিংবা, এটাকে যদি খুব বেশি মনে হয়, রচনার কোনো অনুরণন পাওয়া যায় না। এই গুণটা কবির চিত্তবৃত্তিরই নিঃসার, কিন্তু

কার মধ্যে তার সম্ভাবনা আছে বা নেই তা প্রাথমিক অবস্থায় বলা যায় না ; এবং শিক্ষা, সংযম ও ভাবনার দ্বারা যা উপার্জনীয় তার সবটুকু উপার্জন ক'রে নিতে যিনি পণ করবেন, শুধু তাঁরই অধিকার জন্মাবে অনুপার্জিত, প্রদত্ত অমৃতে।

* * * *

বিশ্বকবিতায় দুটি উল্লেখযোগ্য শতবার্ষিকী এই বছরে পড়েছে ; 'লীভস অব গ্রাস'-এর প্রথম প্রকাশের তারিখ ১৮৫৫, এবং ঐ বছরই বেলজিয়মে এমিল ভেরআরন (Émile Verharen) জন্মেছিলেন। এই সমাপতন আকস্মিক হ'লেও এ-দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধসূত্র খুঁজে পাওয়া সহজ ; যেমন হুইটম্যান ছিলেন নতুন পৃথিবীর প্রবক্তা, তেমনি, আমাদের নিয়তিময় বিশ শতক যখন সদ্যোজাত, তখন এই নতুন কাল যাঁর কণ্ঠে বাণী পেয়েছিলো, তিনি ভেরআরন। নতুন কাল বলতে যন্ত্রনির্ভর, দ্রুত, সক্ষম, উপায়নিপুণ আধুনিক সভ্যতাকে বোঝাতে চাই, যার জন্ম ইওরোপে, বিস্তার আমেরিকায়, এবং প্রচলন সমগ্র পৃথিবীতে। এই কাল হুইটম্যানের অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিলো না—এক শতক আগেও মার্কিন মহাদেশ ছিলো জায়মান এবং অপরিণত—কিন্তু এই কালেরই বন্দনা তিনি ক'রে গেছেন। তাঁর পূর্ববর্তী আমেরিকার কবিরা ছিলেন 'ঔপনিবেশিক', পরিত্যক্ত মাতৃভূমির স্মৃতি তখনো তাঁরা ভুলতে পারেননি, সাহিত্যিক অনুষঙ্গের জন্যও তাকিয়ে থাকতেন আটলান্টিকের পরপারে—বিশেষত ইংলণ্ডের দিকে, যে-দেশের উনিশ-শতকী কাব্যের ধারা অত্যন্ত বেশি উজ্জ্বল নয়। হুইটম্যান এলেন প্রথম আমেরিকার কবি, এবং আমেরিকার প্রথম বিশ্বকবি : ইংলণ্ডে যখন মহারানীর এবং টেনিসনের স্বর্ণযুগ, সেই সময়ে শাস্ত্র-ভাঙা দুর্দান্ত গদ্যছন্দে তিনি উচ্চারণ করলেন আমেরিকার মাটি, শহর, অরণ্য, নদী আর মানুষের হৃদয় থেকে উত্থিত এমন একটি বাণী, যা বিশ্বমানবের অবধানযোগ্য। এডগার অ্যালন পো-র কথা ভুলে যাচ্ছি না ; 'লীভস অব গ্রাস'-এর প্রকাশের আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো, কিন্তু ফরাশি কাব্যে তাঁর প্রতিপত্তি আরো পরের কথা, আর সেই প্রতিপত্তিও—হুইটম্যানের তুলনায়—সীমাবদ্ধ। পো-র মধ্যে প্রথমে বোদলেয়ার ও পরে মালার্মে কী পেয়েছিলেন তা আমাদের

পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব নয়, কিন্তু যাঁরা শুধু ইংরেজি ভাষার ঐতিহ্যের মধ্যে পো-কে জানেন, তাঁদের কাছে এই ফরাশি উন্মাদনার কিছু অংশ দুর্বোধ্য থেকে যাবে, সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে, দেশে-বিদেশে হুইটম্যানের কবিতা অনেক কবিরই ভালো লাগেনি এবং লাগে না, কিন্তু তিনি যে বিশ্ববীণায় একটি নতুন সুর যোজনা করেছিলেন, এ-বিষয়ে সকলেই একমত। অর্থাৎ, পো-র প্রভাব ছিলো বিশেষজ্ঞদের মধ্যে, আর সেই বিশেষজ্ঞরা এমনই প্রতিভাবান যে আমরা হাজার বার পো-কে ফেলে তাঁদেরই রচনা পড়বার জন্য উৎসাহী হ'য়ে উঠি। কিন্তু হুইটম্যান সর্বজনীন, সুদৃঢ়ভাবে মাটিতে পা রেখে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, তাঁকে বিশেষ যন্ত্রপাতি দিয়ে অবলোকন করতে হয় না, দূর থেকেও সহজে তিনি চোখে পড়েন।

* * * *

যে-পৃথিবী হুইটম্যানের স্বপ্ন ছিলো, বাস্তবে তার সম্ভাবনা দেখা দিলো উনিশ শতকের প্রৌঢ়তার সময়ে, প্রথমে ইওরোপে। এই নতুন কালকে নিয়ে কী করবেন, তা ভেবে বিবিধভাবে বিচলিত হ'য়ে পড়লেন কবিরা। কেমন ক'রে খ্রীস্টান ধর্মের সঙ্গে এর সংগতি সাধন করা যায়, টেনিসনের কাছে—অংশত ব্রাউনিঙের কাছেও এই সমস্যাটা বড়ো হ'য়ে উঠলো। ফ্রান্সে ভিক্তর উগো সরল এবং তরল উচ্ছ্বাসে অভ্যর্থনা জানালেন, গু ভিনী আশঙ্কার সুরে বললেন—না জানি এই রেলগাড়ি নামক দানব কোন প্রলয়ের পথে টেনে নেবে মানুষকে! একদিকে জয়ধ্বনির দামামা, আর একদিকে নৈরাশ্য; একদিকে পাণ্ডুর অবিশ্বাস, অন্যদিকে আপোশের চেষ্টা: এই সব রকম সংকট এড়িয়ে ভেরআরন সহজভাবে মিলতে পেরেছিলেন নবযুগের সঙ্গে, তাকে মূর্ত ক'রে তুলতে পেরেছিলেন তাঁর কবিতায়। বিজ্ঞান ভালো না মন্দ, আধুনিক জ্ঞান ধর্মসাধনার অন্তরায় কিনা, এ নিয়ে তিনি টেনিসনের মতো বিতর্ক করেননি; তিনি শুনতে পেয়েছিলেন এই নতুন কালের হৃৎস্পন্দন, তাকে সত্য ব'লে অনুভব করেছিলেন, আর সেই অনুভূতির মধ্যেই কাব্যের প্রেরণা পেয়েছিলেন। এইজন্যেই তাঁর কবিতার প্রধান গুণ প্রত্যক্ষতা, কোথাও তার এতটুকু কুণ্ঠা নেই, সংক্রামক স্বাস্থ্য নিয়ে তারা সামনে এসে দাঁড়ায়, পাঠকের সঙ্গে তাদের বন্ধুতা হ'তে মুহূর্তকাল দেরি হয় না। এই গুণ লক্ষ্য

ক'রে কেউ-কেউ তাঁকে প্রথম বিশ-শতকের পরম কবি ব'লে অভিহিত করেছেন।

* * * *

অথচ এই আবেগদীপ্ত আনন্দের পথ তাঁর পক্ষে নির্বিঘ্ন ছিলো না। ভেরআরন ফরাশি ভাষার কবি, কিন্তু তাঁর পিতা ছিলেন ওলন্দাজ; এবং তাঁর কাব্যের বর্ণবিলাসে ও ইন্দ্রিয়নিষ্ঠায় তিনি সহজেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি রেমব্রাণ্ট ও রুবেন্স-এর আত্মীয়। তবু, ফ্লেমিশ পল্লীজীবনের বৎসলতা এবং ওলান্দাজের জীবনপ্রীতি—এই উভয় উত্তরাধিকার সত্ত্বেও শতকান্তিক সাহিত্যিক ব্যাধি তিনি একেবারে এড়িয়ে যেতে পারলেন না; তাঁর মধ্য-যৌবনের রচনা ('সন্ধ্যা', 'ধ্বংস' ও 'কালো মশাল' নামের তিন খণ্ডের নাটক) বিমর্ষতায় পরিপ্লুত, এমনকি উন্মত্ততার লক্ষণাক্রান্ত। এই সময়ে যেন জীবনের সমগ্রতা উপলব্ধি করার জন্য একান্তভাবে দুঃখেরই অনুশীলন করেছিলেন তিনি, কিন্তু মেঘ কেটে গিয়ে আলো দেখা দিতেও দেরি হ'লো না। বিবাহ করলেন, বিবাহে সুখী হলেন; পত্নীকে উৎসর্গিত তিনটি গ্রন্থের শিরোনামার দ্বারাই তাঁর হার্দ্য পরিবর্তন বোঝা যাবে। পর-পর লিখলেন 'উজ্জ্বল প্রহর', 'অপরাহ্ণ', 'গোধূলি'। এর পর পুনরায় যেন আতঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন, যখন দেখলেন সদ্যোজাত যন্ত্রযুগ বেলজিয়মের মনোহর পল্লী-প্রান্তরগুলিকে শূন্য ক'রে দিচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিবর্ধমান নগরও তাঁকে মুগ্ধ করলো; নগরের মধ্যে মানবিক উদ্যমের যে তীব্র ও সংহত রূপ দেখতে পাওয়া যায়, শ্রদ্ধার সঙ্গে যখনই তাকে স্বীকার ক'রে নিলেন, তখনই তাঁর কাব্যের মধ্যে নতুন স্পন্দন জেগে উঠলো। তাঁর সবচেয়ে স্মরণীয় কবিতাবলীতে তিনি রটনা করেছেন আধুনিক, নগরবাসী, পরিশ্রমী মানুষের সম্মান, তার জয়ের বার্তা ঘোষণা করেছেন। তাঁর এই সময়কার গ্রন্থাবলীর নাম: 'জীবনের আনন', 'দুরন্ত ক্ষমতা', 'বহুমুখী দীপ্তি', 'পরম ছন্দ'। ভাবতে একটু অবাক লাগে যে সমকালীন ইংরেজি ভাষার কবিতায় এই রকমের উৎসাহের সুর শুনতে পাওয়া যায় একমাত্র রাডিয়ার্ড কিপলিং-এ, যে-কিপলিং কবিদের মধ্যে নগণ্য এবং সাম্রাজ্য-মদে কলুষিত। কিন্তু ভেরআরন যে-ভাষায় লিখেছিলেন সে-ভাষায়, তাঁরই অনতিপূর্বে, জন্ম নিয়েছিলেন নগরজীবনের প্রথম কবি, প্রথম আধুনিক কবি: শার্ল

বোদলেয়ার। উনিশ শতকের প্রথম ভাগের ইওরোপীয় কবিতা যদি ইংলণ্ডের হয়, শেষ ভাগের কবিতা মানেই ফ্রান্সের।

* * * *

ভেরআরন যার বন্দনা করেছিলেন সেই যন্ত্রই তাঁকে সংহার করেছিলো : ট্রেনের সংঘাতে মৃত্যু হয়েছিলো তাঁর। এই ঘটনার সূত্রে হিতোপদেশে প্রবৃত্ত হবো না আমরা : এমন কথাও বলবো না যে যন্ত্রের যে-সব বিভীষিকাময় রূপ আমরা সম্প্রতি দেখেছি, তাতে এই কবির কাব্যগত মূল্য তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়েছে। মানুষ তার দুর্বুদ্ধিবশত যা ঘটায় তার জন্য মনোহীন যন্ত্রকে দায়ী করাটা ছেলেমানুষি। উপরন্তু এ-কথাও বিবেচ্য যে আলো আর অন্ধকার যেমন অবিচ্ছেদ্য, তেমনি শ্বেতাঙ্গ মানুষের মঙ্গলসাধনা আর প্রলয়সিদ্ধিও পরস্পরের পরিপূরক কিনা। অন্তত এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ও-দুই বস্তু একই প্রবলতার বিভিন্ন বিচ্ছুরণ ; এবং আমেরিকা আবিষ্কার থেকে অণুশক্তির বিদারণ পর্যন্ত তারা পৃথিবীর ইতিহাসে ভালো-মন্দ যা-কিছু করেছে তার মূলে আছে হিংস্র, উজ্জ্বল, শান্তিহীন উদ্যমের ক্ষমতা। হুইটম্যানের মতোই, ভেরআরন এই উদ্যমের, উৎসাহের চারণ ; হুইটম্যানের মতোই, ভবিষ্যতের দিগন্তে তিনি দেখেছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সমন্বয়, এক সমৃদ্ধ, বিজিত, উদার এবং উন্মুক্ত পৃথিবী। দুই কবির মধ্যে এই সাদৃশ্য 'রক্তের' সম্বন্ধপ্রসূত ; ভেরআরন-এর উপর কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাবের প্রমাণ নেই ; সম্ভবত তিনি 'লীভস অব গ্রাস'-এর নামও শোনেননি। কিন্তু তিনিও উত্তরজীবনে ঞ্রুপদী আলেকজান্দ্রীন পরিহার ক'রে মুক্তছন্দকে বরণ করেছিলেন, আর তাঁর বলীয়ান বাচনভঙ্গিও হুইটম্যানের সঙ্গে তুলনীয়। তুলনীয়, কিন্তু অনুরূপ নয়, দু-জনের প্রতিতুলনারও প্রচুর অবকাশ আছে। এই সংখ্যায় আমরা যে-ক'টি অনুবাদের আয়োজন করেছি, তাতে আশা করি পাঠকের ধারণা হবে যে ভেরআরন প্রবলতার প্রতিনিধি হ'লেও তাঁর কবিতা চিত্রলতা, গভীরতা ও সৌষম্যগুণেও অসামান্য। তা যদি না হ'তো, তাহ'লে রাইনার মারিয়া রিলকের মতো ধ্যানী কবি তাঁর ভক্তদলের মধ্যে গণ্য হতেন না।

* * * *

'কবিতা'য় আমরা সাধারণত কথাসাহিত্যের আলোচনা করি না ; কিন্তু টমাস মান্-এর মৃত্যুর বিষয়ে উল্লেখ না-করলে বিশ্বমানবিক সভ্যতাকেই অশ্রদ্ধা করা হয়। তাঁকে বলা যায় ইওরোপীয় কলাসিদ্ধির 'মহৎ ঐতিহ্যে'র সর্বশেষ প্রতিনিধি ; গ্যেটের পর জর্মন আত্মার অবিকল বাণীমূর্তি ; টলস্টয়ের পরে পাশ্চাত্যভূমির মহত্তম গল্পলেখক। উপরন্তু, আমাদের মনোযোগের উপর অন্য একটি কারণে দাবি আছে তাঁর ; তাঁর গল্প-উপন্যাস বিশেষভাবে কবিদের পাঠ্য ও আলোচ্য। আধুনিক জগতে কবিতা আর কথাসাহিত্য যেন বিপরীত ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ; এমন কবির কথাও আমরা শুনেছি যাঁরা উপন্যাস-পাঠে স্বভাবগুণেই অক্ষম ; এবং এ-দুয়ের বিষমতার আরো নজির দাঁড়িয়ে যায়, যখন কোনো কবি উপন্যাস লেখেন বা ঔপন্যাসিক কবিতা। তবু এ-কথাও সত্য যে আধুনিক সময়েও কাব্যের প্রভাব কথকতায় যেমন বিস্তীর্ণ, তেমনি কবিরাও অনেক সময় উপন্যাসের ঋণ খেয়ে থাকেন ; মেলভিল থেকে কাফকা পর্যন্ত বহু ঔপন্যাসিকের কথা আমরা জানি, যাঁরা আধুনিক কবিদের সধর্মী এবং সহকারী। যাকে বলা হয় সামাজিক উপন্যাস, যার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ ডিকেন্স-এর লেখায় দেখতে পাই, যার নির্ভর মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক সম্বন্ধে, তার আবেদন কবিদের পক্ষে ক্ষীণ হ'তে পারে, কিংবা তা হ'তে পারে অবকাশের উপাদান, শ্রান্ত মস্তিষ্কের বিনোদনের একটি উপায়। কিন্তু যে-উপন্যাসের উপজীব্য মানুষের—সামাজিক নয়, আধ্যাত্মিক জীবন, মানুষের সঙ্গে বিশ্বের অথবা বিশ্বস্রষ্টার সম্বন্ধ, যে-উপন্যাস তার প্রচ্ছন্ন অর্থের চাপে রূপক বা রূপকথার মতো হ'য়ে ওঠে, ক্ষীণ কোনো কাহিনীর সূত্রকে মানবাত্মার শাশ্বত বেদনার আধার ক'রে তোলে, তার কাছে কবিদেরও প্রার্থী হ'য়ে দাঁড়াতে হয়, কেননা সেখানে তাঁরা দেখতে পান তাঁদেরই সহযোগী, প্রতিযোগী এবং মন্ত্রদাতাকে। আর এইরকম ভাবগম্ভীর উপন্যাস আধুনিক যুগে যাঁরা লিখেছেন—প্রুস্ত, কনরাড, লরেন্স, উলফ, জয়স, জীদ, কাফকা—টমাস মান্ তাঁদেরই সগোত্র, শুধু সগোত্র নন, কোনো-কোনো বিষয়ে সর্বাগ্রগণ্য। বিশ শতকের প্রথম অর্ধেকের কথাসাহিত্যে পরম কলাসিদ্ধির উদাহরণ যদি খুঁজতে হয়, তাহ'লে

—প্রুস্ত আর জয়স-এর মহাকাব্য বাদ দিলে—তৎক্ষণাৎ আমাদের মনে পড়বে 'মায়াবী পাহাড়', 'ডক্টর ফস্টাস', 'জোসেফ'-গ্রন্থাবলী ; মনে পড়বে 'ভেনিসে মৃত্যু', টোনিও ক্রেগার', 'ফেলিক্স ক্রুল'। সমকালীন সাহিত্যে তাদের সঙ্গে তুলনীয় কিছুই নেই ; এদের কোনো দাঁড়িপাল্লায় চড়াতে হ'লে অন্য দিকে আমরা রাখতে পারি শুধু গ্যেটের আর টলস্টয়ের রচনাবলী।

* * * *

জীবনে কখনো-কখনো এমন মুহূর্ত আসে যখন আমরা সাহিত্য নামক পদার্থের একটি অখণ্ড সত্তা অনুভব করি ; মনে হয়, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস, প্রভৃতি বিভাগগুলি দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হ'লেও রসবোধের উজ্জ্বলতম মুহূর্তে অর্থহীন, এই ভিন্ন-ভিন্ন নামকরণের দ্বারা মানুষের মন-গড়া এবং সুবিধাজনক একটা ব্যবস্থামাত্র সূচিত হচ্ছে ; মনে হয় এদের মধ্যে বিনিময় সম্ভব, সংমিশ্রণ সম্ভব, প্রতিভার কোনো এক বিস্ময়কর তরঙ্গক্ষেপে সব ভেদরেখা মুছে যেতে পারে। মান্-এর উপন্যাসপাঠের অন্যতম উপার্জন এই অখণ্ডতাবোধ। 'দি ম্যাজিক মাউন্টেন'-এর মতো উপন্যাস প'ড়ে উঠে কী বলতে পারি আমরা, কী বলতে পারি 'ডেথ ইন ভেনিস' বা 'টোনিও ক্রেগার'-এর মতো গল্প প'ড়ে? এরা কী? মহাকাব্য? গীতিকাব্য? রূপকথা? সংগীত? স্থাপত্যকর্ম? তথ্য হিশেবে জানি যে এরা গদ্য ভাষায় লেখা উপন্যাস, কিন্তু প্লট কোথায়? ঘটনা কোথায়? পাত্র-পাত্রীর মধ্যে সামাজিক ব্যবহার অথবা স্বার্থের সংঘাত কোথায়? আর কোথায়ই বা সেই দৈবের হাত, সেই অমোঘ নাটকীয় নিয়তি, যার সাহায্যে সফোক্লিস থেকে টমাস হার্ডি পর্যন্ত বহু লেখক তাঁদের ঘটনাজালের গ্রন্থিমোচন করেছেন? উল্লিখিত তিনটি রচনায় বহু বিষয়ের সমন্বয় ঘটেছে ; কিন্তু কোনো-এক অর্থে তিনটিকেই প্রেমের কাহিনী বললে ভুল হয় না ; ('দি ম্যাজিক মাউন্টেন'-এর বিরাট জটিল অর্কেস্ট্রার মধ্যেও কেন্দ্রস্থলে কাজ ক'রে যাচ্ছে প্রেম)—কিন্তু আমাদের অভ্যস্ত কোনো অর্থে প্রেমের কাহিনী নয় এরা, কেননা যে-দু'জন মানুষকে অবলম্বন ক'রে

প্রেমের জন্ম ও পরিণতি, মান্ তাদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ বেশি ঘটাননি, বাক্যালাপ প্রায় নিষিদ্ধ ক'রে রেখেছেন। 'দি ম্যাজিক মাউন্টেন'-এর বিপুল অবয়বের মধ্যে 'নায়ক-নায়িকা' (এই পরিভাষাও এখানে অসংগত মনে হয়) পরস্পরের সম্মুখীন হ'য়ে কথা বলেছে মাত্র একবার—তুচ্ছ কথা, দু-চার মিনিটের আলাপ, তাও ফরাশি ভাষায়, যেটা তাদের উভয়ের পক্ষেই পরভাষা, এবং দু-জনের মধ্যে একমাত্র সামান্য ভাষা। এ ছাড়া দু-জনের মধ্যে আর যা 'ঘটেছে' তা শুধুই চোখে-চোখে দেখা—এবং মনে-মনে ভাবা—তাও শুধু জর্মন যুবকটিরই দিক থেকে, কেননা রহস্যময়ী বহুচারিণী রুগ্ন রুশ মহিলাটির মনের কথা আমাদের কিছুই জানতে দেয়া হয়নি। এই চোখ দিয়ে দেখা, অবলোকন, নিরীক্ষণ—এটাই 'ডেথ ইন ভেনিসে' সর্বস্ব, এবং উপরন্তু, তার 'নায়িকা' একটি রূপবান কিশোর, আর 'নায়ক' একজন প্রসিদ্ধ, মধ্যবয়সী সাহিত্যিক। এই অস্বভাবী উপাদান নিয়েই গ'ড়ে উঠেছে মর্মান্তিক, আত্মঘাতী এই কাহিনী, যেখানে, প্রায় অপ্রকৃতিস্থতায় উত্তীর্ণ হ'য়েও গুস্তাভ আশেনবাখ কদাচ আমাদের শ্রদ্ধা বা অনুকম্পা হারান না, বিকৃত কামনার বশবর্তী হ'য়েও সকল মলিনতার ঊর্ধ্বে উজ্জ্বল হ'য়ে বিরাজ করেন। তেমনি, 'লটে ইন হ্বাইমার'-এও বাল্যসখী শার্লটে যখন গ্যেটের সঙ্গে আর-একবার দেখা করতে এলেন, তখন গ্যেটে রীতিমতো বয়োবৃদ্ধ এবং বিশ্ববিশ্রুত, আর লটের বয়সও যাটের পরপারে। ভোজের সভায় বহু লোকের সমক্ষে একবার মাত্র দেখা হ'লো, আর তারপর—গ্যেটেরই আয়োজনের ফলে—নিভৃতে একবার। গ্রন্থের সেই প্রচণ্ড উপসংহারে গ্যেটে ঋষির মতো ধীরে-ধীরে কয়েকটি কথা বললেন, আর তারপর লেখকের আর কিছুই বলবার থাকলো না, পাঠকের আর কিছুই ইচ্ছে করার থাকলো না। কোনো গ্রন্থেই কিছু 'ঘটে' না, ; মিলন নেই, বিরহ নেই, আশা বা হতাশাও নেই, ; তবু আমরা আদি রিপুর পূর্ণ তীব্রতা অনুভব করি ; পাত্র-পাত্রী বৃদ্ধ, তবু অনুভব করি ; বাসনার লক্ষ্য একজন বালক, তবু অনুভব করি। এই সংরাগ যেন ছত্রে-ছত্রে পরিকীর্ণ, পংক্তি ছাপিয়ে উপচে পড়ছে, ; ঘরের বর্ণনায়, দৃশ্যের বর্ণনায়, অবান্তর প্রসঙ্গে (যদিও আসলে কিছুই অবান্তর নয়), এমনকি বিশ্বের যাবতীয় সমস্যার গুরুতর

আলোচনার মধ্যেও সেই আগুন মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে বিদ্যুতের মতো জ্ব'লে যাচ্ছে। যেন প্রেম নামক বস্তুটাকে মান্ তার সারাৎসারে পরিণত ক'রে নিয়েছেন—কত বয়স, নারী না পুরুষ, তাতে কিছুই এসে যায় না আর, তার অনুভূতিটাই সব, তা যেন বিশ্বব্যাপী এক অমর হৃৎপিণ্ডের মতো ধ্বনিত হচ্ছে বহুবিচিত্র পরিচ্ছদের অন্তরালে। এইজন্যই এ-সব গ্রন্থকে কাব্য ব'লে চিহ্নিত করতে ইচ্ছে করে; এর উপাদান সামাজিক আচার-ব্যবহার নয়, মানুষের মনের আদিম ভাবমণ্ডল, কবির সেই নীহারিকাময় জগৎ, যা থেকে বহু ধৈর্যের ফলে ধীরে এক-একটি কবিতার নক্ষত্রবিন্দু উদ্গত হ'য়ে থাকে। এ-সব গ্রন্থ আধুনিক যুগের নূতন পুরাণের উদাহরণ।

* * * *

যাকে 'সুখপাঠ্য' বলে, মান্ তা কখনোই নন। শ্রেষ্ঠ জর্মন মানসের প্রতিভূ তিনি, বিস্তীর্ণরূপে গুরুভার, ক্লান্তিহীনরূপে গম্ভীর, নির্ভীকভাবে ক্লান্তিকর। তাঁর গ্রন্থের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়েই অনেক বলবান পাঠকও পিছু হঠতে পারেন; পাতার পর পাতা পাথরের মতো নীরন্ধ্র, তার মধ্যে সংলাপের সোপানপংক্তি কদাচ চোখে পড়ে, অনুচ্ছেদের বিরাম বেশি পাওয়া যায় না, অবিচ্ছেদী আখ্যান আর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার চাপে পাত্র-পাত্রীর নামের উল্লেখ পর্যন্ত বিরল। আকার সুদীর্ঘ, এবং ছোটো উপন্যাস বা ছোটোগল্পও—অধিকাংশ ক্ষেত্রে—একই রকম গুরুত্ব-দ্বারা আক্রান্ত। যে-সাহসী (এবং মেধাবী) পাঠক এতৎসত্ত্বেও যাত্রা শুরু করবেন, তিনি অবিলম্বেই এক বিশাল, বন্ধুর, বিচিত্র-দৃশ্যময় অরণ্যের মধ্যে দেখতে পাবেন নিজেকে, যেখানে মানুষের কামনা ও ভাবনা, সাধনা ও স্বপ্ন দলে-দলে বন্য নগ্নতায় উদ্ঘাটিত, যেখানে দূরপ্রসারী বহুমুখী উল্লেখের রাশি প্রতিটি বস্তুকে তৃতীয় আয়তন দান ক'রে পূর্ণাঙ্গ ক'রে তুলছে, পৃথিবীর সমগ্র ভূগোল যেখানে দৃশ্যমান, এবং পোকার পাখার কম্পন থেকে নক্ষত্রের বিকিরণ পর্যন্ত মহাবিশ্ব বিধৃত হ'য়ে রয়েছে, আর যেখানে দর্শন, গণিত, সংগীত, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, উপকথা—মানব-চিত্তের যা-কিছু নিঃসরণ, মানব-সভ্যতার যা-কিছু সম্পদ, সেই প্রত্যেকটি বিষয়কে বনস্পতির মতো জড়িয়ে-জড়িয়ে বেড়ে উঠছে কূট বিতর্কের

লূতা-তন্তু, জটিল চিন্তার ঊর্ণাজাল। সহজ হবে না সেই যাত্রা, কিছুক্ষণ পরে-পরেই হাঁপ ধরবে, বিশ্রাম নিতে হবে; এই এক আশ্চর্য জগৎ—যার অধিবাসীরা 'আলাপ' করে না, দীর্ঘ অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদে অনর্গল জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ক'রে যায়, তারপর তার যথোপযুক্ত প্রত্যুত্তরও পরিপাক করে, যার প্রতিটি তথ্য বিশ্বকোষের বিস্তার ও যাথার্থ্য এবং স্থাপত্যের প্রত্যক্ষতা নিয়ে উপস্থিত, এবং যার তথ্যাবলী পরস্পরের অন্তঃপ্রবিষ্ট হ'য়ে পাশ্চাত্য সংগীতের মতোই এক ধারাবাহিক প্রাসাদ নির্মাণ ক'রে চলেছে—এই জগতের জলবায়ুর সঙ্গে অভ্যস্ত হ'তেও প্রয়োজন হবে সময়সাপেক্ষ সচেতন প্রয়াস। অথচ, এই ক্লেশ সত্ত্বেও, প্রয়াস ত্যাগ করা সম্ভব হবে না, একবার আরম্ভ করলে শেষ পর্যন্ত না-দেখে উপায় নেই। যাকে আমরা সাধারণত 'সস্‌পেন্স' বলি, ঘটনার পরিণতি জানবার সেই আগ্রহের কোনো অবকাশ নেই এখানে; অথচ অন্য কোনো দুর্বার আকর্ষণ আছে, যা চুম্বকের মতো ধীরে-ধীরে আমাদের টেনে নিয়ে যায়; যেন এক মহান মনীষার জালেই ধরা পড়ি আমরা, ছটফট করলেও পালাবার আর উপায় থাকে না। আর যতই আমরা অগ্রসর হই, উপসংহার যতই নিকটবর্তী হয়, ততই আমরা মুগ্ধতায় বিহ্বল হ'য়ে পড়ি, যখন দেখি এই বিপুল মনীষিতা সত্ত্বেও পাত্র-পাত্রীরা রক্তমাংসে বাস্তব, এবং অনুভব করি এই ভূরিপরিমাণ উপাদানের মধ্যে ঐক্যের সংহতি, অভিপ্রায়ের অখণ্ডতা, তাৎপর্যের বহুমুখী হীরক-দ্যুতি। শেষ পর্যন্ত, উল্লিখিত প্রতিটি তথ্য আমাদের মনের মধ্যে প্রতীক হ'য়ে জন্ম নেয়, কাহিনীর অংশ হ'য়ে ওঠে রূপক, এবং পাত্রপাত্রীরা দেশকালের অতীত বিশ্বমানবের প্রতিভূ। যে-গল্প কাহিনী একবার পড়লে আর ভোলা যায় না, মহাভারত বা বাইবেলের গল্পের মতো জীবনের নিত্যসঙ্গী হ'য়ে ওঠে, তার উদাহরণ টলস্টয়ের পরে টমাস মান্ রেখে গেলেন।

* * * *

এই মহাকবির বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ দূরে থাক, অংশত সম্পূর্ণ আলোচনারও অবসর বা পরিসর নেই আমাদের। তাঁর রচনার মধ্যে প্রবেশ করেছে জর্মনির প্রকৃষ্টতম সাধনার ধারা; শোপেনহাওয়ার, নীটশের দর্শন, হ্বাগনারের

সংরক্ত সংগীত, আইনস্টাইন এবং ফ্রয়েডের যুগান্তকারী আবিষ্কার। শেষোক্ত দু-জনের ভাবনা 'দি ম্যাজিক মাউন্টেন'-এর প্রধান উপাদান বলা যায়: বস্তুত, মান্-এর অনেক উপন্যাসেই কালের একটি স্পর্শসহ মূর্তি ধরা পড়েছে—পরম মায়া, অজেয় মায়া এই কাল। আর মানুষের অবচেতনের ক্ষমাহীন বিশ্লেষণের ফলে আমাদের সবচেয়ে লজ্জাকর লালসাকেও তিনি গোপন থাকতে দেননি; গ্যেটের মতো তিনিও উপলব্ধি করেছেন সদসতের অন্যোন্য সম্বন্ধ, ভগবান আর শয়তানের প্রকাশ্য প্রতিযোগিতা আর প্রচ্ছন্ন মিতালি। তাঁর গ্রন্থাবলীকে বলা যায় বিভিন্ন মৌলিক সম্বন্ধ বিষয়ে গবেষণা: ভালো আর মন্দের, দেহ আর মনের সম্বন্ধ, শিল্পী আর সমাজের, শিল্প আর জীবনের সম্বন্ধ, সময় আর মহাকালের, স্থান আর মহাবিশ্বের সম্বন্ধ। মানবিক বৃত্তি, তাঁর ধারণায়, একাধারে দূষিত এবং মহিমান্বিত; বিশুদ্ধ সৌন্দর্য ক্ষণিকভাবে দেখা দেয় শুধু বালক অথবা শিশুর রূপ নিয়ে; তাছাড়া আমাদের যা-কিছু আদরণীয়—প্রতিভা, নারীর রূপ, শিল্পসৃষ্টি, সামাজিক হিতৈষণা, সবই কলুষিত, ব্যাধিত, ধ্বংস-দূত, শয়তানের ষড়যন্ত্রী। তাই তাঁর রচনা একদিকে যেমন নিখিল সৌন্দর্যের স্তবগান, তেমনি অন্যদিকে আতঙ্কের স্তূপীকরণে ভয়াবহ; মহাভারতে যদুকুলের ধ্বংসের মতো তিনিও 'দি ম্যাজিক মাউন্টেনে' একটিমাত্র পরিচ্ছেদে এক সমগ্র সভ্যতার সর্বনাশের ছবি এঁকেছেন; 'ডক্টর ফস্টাস'-এ প্রতিপন্ন করেছেন দৈব প্রতিভার নারকী প্রকৃতি, 'ডেথ ইন ভেনিসে' দেখিয়েছেন প্রেম আর মৃত্যুর অঙ্গাঙ্গী সংযোগ। অপেক্ষাকৃত কম-জানা গ্রন্থের মধ্যে 'দি ট্রান্সপোজড্ হেডস'-এ দেহ-মনের দ্বন্দ্বের বিবরণ দিয়েছেন, যে-বিষয়টি ফিরে এসেছে তাঁর শেষ বয়সের ছোটো উপন্যাসে, ইংরেজিতে যার নাম হয়েছে 'দি ব্ল্যাক সোয়ান'। সুখের বিষয়, মৃত্যুর আগে তাঁর যৌবনে লেখা 'ফেলিক্স ক্রুল' গল্পটি, যাকে বলেছিলেন তাঁর 'হৃদয়ের নিকটতম গল্প'—তাকে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে পরিণত ক'রে গেছেন: এই স্বভাব-জোচ্চোরের বিস্ময়কর উপাখ্যানে মান্-এর বিশ্লেষণী প্রতিভা তাঁর অভ্যস্ত পাঠককেও স্তম্ভিত ক'রে দেয়।

এবং তাঁর গঠনশক্তির কথা চিন্তা করলেও স্তম্ভিত হ'তে হয়। রূপকল্পের দিক থেকে, তাঁর উপন্যাসের সঙ্গে তুলনীয়—স্থাপত্য নয়, সিম্ফনি-সংগীত, অভিজ্ঞ সমালোচকেরা এই রকম ব'লে থাকেন। পাশ্চাত্য সংগীত আমরা কমই জানি, কিন্তু লক্ষ্য না-ক'রে উপায় নেই যে তাঁর রচনার মধ্যে পুনরুক্তি একটি বিশেষ যন্ত্র, এবং অন্যত্র ঘটনার উদ্ভাবন যে-কাজ করে, সেই কাজ আরো অব্যর্থভাবে সাধিত হয় বহুলাঙ্গ উল্লেখের উপায়ে। আপাততুচ্ছ কোনো বস্তু বা দৃশ্য—প্রথম উল্লেখে যাকে আমরা ভালো ক'রে হয়তো লক্ষ্য করিনি—তা কোনো এক সময়ে ফিরে আসে গভীর তাৎপর্যে মণ্ডিত হ'য়ে, যে-তাৎপর্য, শুধু সেই অংশটিকে নয়, আনুপূর্বিক সমস্ত আখ্যানটিকেই আলো ক'রে তোলে। মান্ তাঁর প্রকৃত অভিপ্রায় বহুক্ষণ পর্যন্ত গোপন রাখেন; 'মারিও অ্যাণ্ড দি ম্যাজিশিয়ান' গল্পটার একেবারে শেষ পাতায় না-পৌঁছনো পর্যন্ত আমরা বুঝতেই পারি না যে এই হাস্যরসোজ্জ্বল আপাতসরল কাহিনীতে মুসোলিনি-শাসিত ফাশিস্ট ইটালিকে সুতীব্র বিদ্রূপ করা হয়েছে। 'ডক্টর ফস্টাস'-এ একই কাহিনীর মধ্যে তিনটি বৃহৎ বিষয় বিধৃত হ'য়ে রয়েছে, কিংবা লেখক একই কাহিনীকে একই সঙ্গে তিনটি বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত করেছেন: প্রথমত, ফাউস্টের পুরোনো গল্প নতুন ক'রে লিখে গ্যেটের সঙ্গে প্রকাশ্য প্রতি-যোগিতায় নেমেছেন; দ্বিতীয়ত, শিল্পপ্রতিভার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন, আর তৃতীয়ত, মূর্ত ক'রে তুলেছেন নাৎসি জর্মনির ভীষণ ইতিহাস। গ্রন্থের নায়ক আমাদের চিরচেনা ফাউস্ট, এখানে তাঁর নাম আড্রিয়ান লেভেরকুন, প্রতিভাবান গীতস্রষ্টা তিনি, আবার জর্মনি দেশটাকেও তাঁরই মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু একেবারে একসঙ্গেই সবটা দেখা যায় না, অতি ধীরে লেখকের সমগ্র উদ্দেশ্য উন্মাচিত হ'তে থাকে—এই সমস্ত ব্যাপারটা 'কী নিয়ে', গ্রন্থ শেষ না-করা পর্যন্ত ঠিকমতো ধারণাই করা যায় না। এই বহুলাঙ্গতার লক্ষণ থেকে মুক্ত, মান্-এর প্রধান গ্রন্থের মধ্যে একমাত্র জোসেফ-জীবনী, কারো-কারো মতে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি—কিন্তু সম্পদ যেখানে অজস্র সেখানে শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে মনস্থির করা অসম্ভব।

আশ্বিন ১৩৬২

মান্-এর মতে শিল্পীরা দুই জাতের : কেউ দেবতা, কেউ বা সেইন্ট। 'দেবতা'র মধ্যে আছেন গ্যেটে আর টলস্টয়, দীর্ঘজীবী, অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী, ভোগে বিলাসে বহুল অভিজ্ঞতায় পূর্ণাঙ্গ মানুষ। 'সেইন্ট'-র উদাহরণ শিলার আর ডস্টয়েভস্কি—রুগ্ন, দারিদ্র্যপীড়িত, মহাপ্রাণ, শিল্পের শহীদ। উদাহরণ বাড়িয়ে যেতে পারি আমরা : দেবতার দলে রবীন্দ্রনাথ, বর্নার্ড শ (অন্তত তাঁর প্রণয়-পত্রাবলীর নজিরে), রোদ্যাঁ ; সেইন্টের দলে বোদলেয়ার, রিলকে, লরেন্স। আর মান্ নিজে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে মুহূর্তকাল ভাবতে হয় না। ব্যাধির বিষয়ে তাঁর প্রবল আসক্তির কথা জানি আমরা : 'দি ম্যাজিক মাউন্টেন'-এ সমগ্র ঘটনাস্থল যক্ষ্মার চিকিৎসালয়, নারী ব্যাধিত ব'লেই মোহিনী, পরিবেশ অপ্রকৃতিস্থ ব'লেই দুর্বার আকর্ষণে ভরা। 'ডক্টর ফস্টাস'-এ নায়কের দেহে শয়তান প্রবেশ করলে উপদংশরোগের রূপ নিয়ে ; 'দি ব্ল্যাক সোয়ান'-এ বর্ষীয়সীর আকস্মিক নববৌবন শেষ পর্যন্ত মারাত্মক রোগ ব'লে ধরা পড়লো ; 'ডেথ ইন ভেনিসে' প্রেমের উন্মাদনার শেষ পরিণতি ঘটলো কলেরার মহামারীতে। এই সমস্তই আছে, কিন্তু এই সমস্তর ঊর্ধ্বে আছেন টমাস মান্। নির্ভীক স্রষ্টা তিনি, বিষয়ের নির্মম অধিকর্তা, আর যদিও তাঁর পাত্রপাত্রীর মধ্যে একজনেরও লেভিন বা বা নাটাশার 'স্বাস্থ্য' নেই, তবু ডস্টয়েভস্কির দুঃসহ অস্থিরতাও তাঁর রচনাকে স্পর্শ করেনি। 'দি ব্রাদার্স কারামাজভ্স্'-এর লেখক নিজেই তাঁর পাত্র-পাত্রীর ব্যাধির মধ্যে লিপ্ত হ'য়ে আছেন, কিন্তু মান্কে বলা যায় তাঁর কুশীলবের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষক—বিজ্ঞানী যে-ভাবে শবব্যবচ্ছেদ করেন, কঙ্কাল অধ্যয়ন করেন, তাঁর রচনার প্রক্রিয়া ঠিক সেই রকম। উপরন্তু স্মর্তব্য যে টলস্টয় তাঁর বিখ্যাত 'স্বাস্থ্য' সত্ত্বেও 'ইভান ইলীচের মৃত্যু' নামক পাতালস্পর্শী গল্প লিখেছিলেন, এবং তাঁর উপন্যাসে মৃত্যু, হত্যা, আত্মহত্যার অভাব নেই। কিন্তু টলস্টয়ের মতোই, মান্কে শেষ পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টির চেয়েও মহৎ ব'লে মনে হয় (যা ডস্টয়েভস্কি বা কাফকাকে কখনো হয় না)—তাঁর রচনাবলী পাঠ করার পরে আমরা যেন তাঁকে দেখতে পাই দূরে কোনো সর্বদর্শী নক্ষত্রের মতো শান্ত হ'য়ে আছেন। অ-'ধার্মিক' টলস্টয়ের মতো, মান্ যা দেখতে পান তাতে অংশ নেন না, ; তাঁর আসন দেবতার মণ্ডলে।

বর্ষ ২০, সংখ্যা ১

সনেটগুচ্ছ

বুদ্ধদেব বসু

কেন?

এতে নয় জড়িত জনগণের বিরাট নিয়তি—
অভ্যুদয়, পতন, পথ্য, সেবা, স্বাধীনতা। কোনো
হাত নেই ইতিহাসে। অর্থ আর মোক্ষের প্রগতি
আনেননি বাল্মীকি, ভার্জিল, সাফো। তবে কেন—কেন?

ব্যর্থ কাম, ক্রোধের তৃপ্তির জন্য? প্রতিহিংসার
ছদ্মবেশ? বিকল অহমিকার কুটিল চাতুরী?
না কি শুধু—অন্য কিছু নেই ব'লে—এই ছলে কালের প্রহার
ভুলে থাকা?…কেন, বলো! এই প্রশ্ন—মনে হয়—মৌলিক, জরুরি।

কিন্তু কোনো উত্তর কোথাও নেই। সবচেয়ে কম
কবির আলস্যময় উচ্চারণে, যেন সে নিজেরে কোনোদিন
শুধায়নি উদ্দেশ্য, কারণসূত্র, উৎসর্গের নিহিত নিয়ম ;

শুধু, কোনো অচিকিৎস্য ক্ষরণের ব্যাধির অধীন—
যতক্ষণ পৃথিবী চলায় মত্ত—সে গেছে মোমের মতো জ্ব'লে,
আপনারে আলো দিয়ে, নামহীন, প্রাচীন অনলে।

কবি : তার ক্ষমতার প্রতি

তুমি, যে দিয়েছো সব, সেই তুমি আমার পথের
দুই দিকে ছড়িয়ে রেখেছো কত রঙিন কানন—
বিক্ষেপ, জয়ের নেশা, ত্যাগের চটুল প্রলোভন :
বাস্তুভিটা কোথাও জোটেনি আজো ; শুধু হেরফের,

ভ্রমণ, রাত্রিবাস, পান্থশালে নতুন শপথ,
আঙিনায় ঋতুপুষ্প। এইমতো, নিজেরে খণ্ডন ক'রে,
হেমন্তেরে দূরে ঠেলে অবিরল বসন্তবাহারে
দিয়েছো বিস্তীর্ণ ফাঁকি। আমার প্রকোষ্ঠে তুমি অতীব বৃহৎ।

এখন, মধ্যপথে, এখনো কি আসেনি সময় ?
পারি না কি তোমারে ছাড়িয়ে যেতে, যেখানে মলয়
ম'রে যায় বরফের ষড়যন্ত্রে—সেই গর্ভে সারাৎসার ঢেলে

ক্ষীণ, ছোটো, প্রচ্ছন্ন, দুর্বল হ'য়ে, যদি কোনো দূরতর মেঘে
কাটিয়ে কঠিন রাত্রি, একদিন বীজের আবেগে
ফ'লে উঠি নিটোল, উজ্জ্বল, পূর্ণ একটি আপেলে !

সনাতন সংঘর্ষ

বাসনা অপরিসীম, কিন্তু কত দুর্বল ইন্দ্রিয় !
হ'য়ে থাকি বধির, যতক্ষণ চক্ষু ম্রিয়মাণ ;
পদ্মরাগ চুম্বনে হারিয়ে যায় ; দৃষ্টিহীন কণ্ঠ করে পান
মদের সোনার কান্তি। অসম্ভব, সম্ভোগে দ্বিতীয়।

বলেছিলো কোনো-এক লিপ্সাময় বিষণ্ণ প্রেমিক :
'সে আমারে সর্বস্ব বিলিয়েছিলো—রত্ন, ফুল, ঝংকার, চন্দন ;
কিন্তু আমি, সনাতন সংঘর্ষে হতাশ হ'য়ে, চেয়েছি একটি নিঃসরণ
বেছে নিতে—দেহময়, দেহচ্যুত জ্যামুক্তির চঞ্চল নিরিখ—

অর্থাৎ, গলার স্বর। কারে বলে পাওয়া, তা জেনেছি
আঁধারে, ঘুমের ঘোরে, রক্তের ফেনিল চ্যাঁচামেচি
শান্ত হ'লে—সে যখন ডেকেছে আমার নাম অমল নিস্বনে,

আর সেই ফুৎকারে দেহের তন্ত্র, হৃৎপিণ্ডের অতল গহ্বর
হয়েছে শ্রবণময়—যেন কোনো পথিকের প্রতীক্ষার সার্থক প্রহর
সমুদ্র লুণ্ঠন ক'রে ডুবে গেলো দূর টেলিফোনে।'

'দুই পাখি'

যখন রাত্রি নামে—নয়, যাকে লোকে বলে রাত,
কিন্তু নক্ত, নিশীথিনী, শর্বরী, যামিনী, বিভাবরী—
ডুবে যায় যান, গান, দোকানের দৈনিক গাগরি,
লাল-চোখ ল্যাম্পোস্টের পাহারায় গভীর ফুটপাত

প'ড়ে থাকে, মুছে-ফেলা শান্ত স্লেট, নির্মল বিবেকবান
নিস্বপ্ন রিকশাওলা—আর সেই নির্বাণের অমেয় নেশায়
ফুরায় লেখক, ছাত্র, দম্পতীর অধ্যবসায় :—
তখন, কবির মতো, আঁধারের স্বাধীন সন্তান,

বিড়াল বেরিয়ে আসে—হিংস্র, মৃদু, গম্ভীর, সুদূর ;
যেন কত গুপ্ত কাম ললাটের কুটিল ত্রিশূলে
বিঁধে নিয়ে, চ'লে যায় সহনীয় সংসার ছাড়িয়ে :

আর তৃপ্ত, নিরাপদ, সমাদৃত আমার কুকুর
চেয়ে থাকে তার দিকে, বারান্দার রেলিঙে পা তুলে,
অসুস্থ শিল্পীর প্রতি গৃহস্থের ঈর্ষা চোখে নিয়ে।

মিল ও ছন্দ

মানি, এক অন্তর্যামী মুখ থেকে ভাষা কেড়ে নিয়ে
ভ'রে দেয় আপন গোপন অর্থে সব উন্মীলন ;
ছিঁড়ে ফেলে প্রচ্ছন্ন প্রেমের চিঠি : বিরহ, মিলন,
আশা, জীবনের আকাঙ্ক্ষারে কৌশলে ছিনিয়ে

ভাঙে যে-নূতন গানে সেখানে জীবন ম'রে যায়।
মানি—কিন্তু জানি না, দেখিনি তারে। অন্তরঙ্গ, সবচেয়ে দূর,
কিছুই বলে না, শুধু ভেদ ক'রে বেজে ওঠে সুর—
সুর নয়, শূন্যতায় তার বেঁধে নিঃশব্দে বাজায়

দেবতা, নির্জ্ঞান মন, না কি এক চতুর শয়তান ?
তার মুখে অনন্ত রাত্রির মায়া। তাই সে করুণা ক'রে
পাঠিয়েছে প্রতিভূ, প্রবক্তা, দূত—ছন্দ, মিল, ধ্বনির ইশারা,

নিরঞ্জন গণিত, আবহমান নিরুক্তের অমোঘ বিধান—
যার পূত শাসনে সঞ্চিত জল, নর্দমার স্বেচ্ছায় না-ঝ'রে
হ'য়ে ওঠে অধীন, উদ্দেশ্যময়, উজ্জ্বল ফোয়ারা।

নেশা

মাতাল, মাতাল হও—বোদলেয়ার দিলেন বিধান—
অবিরাম পেণ্ডুলামে যে তোমার উপাংশুঘাতক,
সেই ক্রুর কালের চতুরতর হও কালান্তক :—
পুণ্য, প্রেম, মদিরা, কবিতা তাঁর প্রখ্যাত নিদান।

তাঁর আজ্ঞা অমোঘ ; অথচ দান, জপ, তপ, ব্রত,
এ-সবের ক-অক্ষর আশৈশব গোমাংস আমার,
দিগন্তে মিলায় ক্রমে রশ্মিরাগ প্রেমান্ত-সন্ধ্যার ;
এবং তন্মাত্র ট্যাঁকে পানপাত্র দূরপরাহত।

বাকি থাকে কবিতা—অস্তিত্বময় অণুর বন্ধন,
হ্লাদিনী, ব্যাধির বীজ, উন্মাদক, নিষ্ঠুর, অসুখী,
সরস্বতী, ভেনাস, ক্ষণিক লক্ষ্মী, অনন্ত বাসুকি—

মেটাতে আমার তৃষ্ণা আমারেই করে সে মন্থন !
ভালো—কিন্তু বলো দেখি, হ'তে হবে আর কতকাল
একাধারে দ্রাক্ষাপুঞ্জ, বকযন্ত্র, শুঁড়ি ও মাতাল !

কর্কটক্রান্তি

দীর্ঘ দিন শেষ হ'লো : প্রভু, ধন্যবাদ।
এখনই, উত্তর দেশে, নিশীথেও নেয় না বিদায়
যদিও গোধূলিরাগ, পর্দা টেনে, তবে খুঁজে পায়
পথিক, প্রার্থিত ঘুম, প্রেমিকেরা, ভূমার আস্বাদ :

তবু এই দীর্ঘতম দিবসেরই অমোঘ সন্তান
কুয়াশা, সুন্দর হিম, বরফের শান্তির সংহতি ;—
জানি না এ গ্রীষ্মের চরম, না কি শীতের উত্থান,

শেষ, না আরম্ভ মাত্র ; কৈবল্য, না কুমারসম্ভব :
কেননা মহাকালের নৃত্যে নেই ভাবী ও সম্প্রতি,
আছে শুধু তালের তরঙ্গে ফোটা নূতন উদ্ভব,

বিলয়মৃণালে পদ্ম, অবনতি যৌবনচূড়ায়।
সময়নির্ভর সব সম্ভাবনা। হয়তো বা আমারেও তবে
অন্তরের ক্ষমাহীন তিলোত্তমা, রূপের বাস্তবে
ধরা দেবে একদিন—শুধু যদি অপেক্ষার ধৈর্য না ফুরায়!

অপেক্ষা

উল্লোল দিনের পর দিন, আমি তোমারই উদ্দেশে
নিজের নিরতিশয় অন্তঃসার বাঁচিয়ে চলেছি;
অপচয়, অনিশ্চয়, অবশ্যের উন্মুখর মাছি,

যদিও মুখোশ প'রে সময়ের করে অভিনয়—
শুধু তা-ই নিতে পারে, প্রিয়তমা, যা তোমার নয়;
চালুনির অবিরল ব্যভিচারে তবু ঠেকে যায় অবশেষে

গাদ, ক্বাথ, বুদ্বুদের পরপারে এক কণা অব্যয় কস্তুরী,
কঠিন ছিপিতে আঁটা, স্বচ্ছতায় সঞ্চিত আঁধার;
অথবা, প্রপাত যার অভিপ্রায় কোনোদিন চুরি
ক'রে নিতে পারবে না—সেই দূরনিবদ্ধ নীহার।

মাঝে-মাঝে মনে হয়, দেবযানী, বুঝি বা তুমিও
আমার সন্ধান বুঝে, একদিন ভেঙে দেবে বাঁধ;
অথচ যেহেতু শুধু অপেক্ষাই অক্ষয়মেয়াদ,
না যদি ভাঙাও, তবু এই ঘুম মানি রমণীয়।

ভ্রমণ

শার্ল বোদলেয়ার

উৎসর্গ : মাক্সিম দ্যু কাঁ

পঞ্জিকা, রঙিন ছবি, বালকের হৃদয়লুণ্ঠন,
দেখায় বিশ্বেরে তার অতিকায় ক্ষুধার সমান;
যে-বিশ্ব বিরাট হ'য়ে দীপ্ত করে সন্ধ্যার লণ্ঠন,
স্মরণের দৃষ্টিকোণে কত ক্ষুদ্র তার পরিমাণ!

একদা প্রভাতে যাত্রা; মস্তিষ্কের বিবরে অনল,
হৃদয়ে বিদ্বেষ, না কি তিক্ত কাম, কে করে যাচাই!
তরঙ্গের ছন্দের পিছনে ছুটে, হিল্লোলে চঞ্চল,
আমাদের অসীমেরে সমুদ্রের সীমায় নাচাই।

কেউ ছোটে দূষিত স্বদেশ ছেড়ে মোহন অয়নে,
শৈশবের বিভীষিকা পার হ'তে উৎসুক অন্যেরা,
ক্বচিৎ জ্যোতিষী কেউ ডুবে মরে নারীর নয়নে—
মদমত্তা সার্সি কোন, মারাত্মক অম্লবাসে ঘেরা।

জান্তব রূপান্তরে পরিণতি সভয়ে ঠেকাতে
তারা হয় মাতাল আকাশ, আলো, দীপ্ত নীলিমায়;
তুষারের তীক্ষ্ণ হুল, তামা-জলা রৌদ্রের সম্পাতে
ক্রমশ চুম্বনচিহ্ন লুপ্ত হয় দিগন্তসীমায়।

কিন্তু শুধু তারাই যথার্থ যাত্রী, যারা চ'লে যায়
কেবল যাবারই জন্যে, হালকা মন, বেলুনের মতো,
নিশিত নিয়তি ফেলে একবার ফিরে না তাকায়,
কেন, তা জানে না, শুধু "চলো, চলো" বলে অবিরত।

তাদের বাসনা পায় মেঘপুঞ্জে উজ্জ্বল বিন্যাস ;
স্বপ্নে হানা দিয়ে যায়—সৈনিকেরে যেমন কামান—
পরিবর্তনীয় দেশ, মহাশূন্যে ইন্দ্রিয়বিলাস,
যার নাম কখনো জানেনি কোনো মানবসন্তান।

২

কী বিকট! লাটিম, বলের মতো ওঅল্‌জের তালে
উল্লোল আবেগে নাচি ; কৌতূহল—প্রমত্ত বিদ্যুৎ—
ঘুমের ঘোরেও তার যন্ত্রণার আন্দোলন ঢালে,
সূর্যেরে চাবুক মারে ক্ষমাহীন কোন দেবদূত।

খেয়ালের খেলা, যার লক্ষ্য শুধু পিচ্ছিল প্রমাদ,
কোথাও তা নেই, তাই মনে হয় নেই কোনখানে!
মানুষ, হৃদয়ে যার দুরাশার নেই অবসাদ,
অবিরাম উন্মাদের মতো ছোটে শান্তির সন্ধানে।

আমাদের প্রাণ তার ইকারীর [১] এষণে আকুল
ডাকাত-নৌকোর মতো। তক্তা কাঁপে—"খোলো, খোলো চোখ!"
উন্মাদ উত্তপ্ত কণ্ঠ হেঁকে ওঠে উল্লম্ব মাস্তুল,
"প্রেম···কীর্তি···পুরস্কার!" ঠেকে চরে—সেই তো নরক।

১। Icaria : আধুনিক গ্রীক ভাষায় Nikaria : এশিয়া মাইনরের নিকটবর্তী দ্বীপ। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ফরাশি সোশ্যালিস্ট এতিয়েন কাবে (Etienne Cabet) প্রণীত Voyage en Icarie গ্রন্থটি সমগ্র পাশ্চাত্যলোকে প্রসিদ্ধ ছিলো : তাতে লেখক তাঁর কাল্পনিক আদর্শ রাষ্ট্রকে ইকারী দ্বীপে স্থাপন করেছিলেন।

মাল্লার বিহ্বল চোখে প্রতি ক্ষুদ্র দ্বীপের আভাস
হ'য়ে ওঠে আরেক এলদোরাদো, নিয়তিপ্রদীপ,
ব্যভিচারী কল্পনার উচ্ছৃঙ্খল, উন্নিদ্র উল্লাস
ভোরের আলোয় ছাখে শুধু বন্ধ্য পাথরের দ্বীপ।

হায় রে সিন্ধুর পারে রূপকথা-রাজ্যের প্রেমিক!
বেড়ি বেঁধে জলে তারে ফেলে দাও—এই তো সময়!
উদার আমেরিকার উদ্ভাবক মাতাল নাবিক,
যার স্বপ্ন তরঙ্গেরে ক'রে তোলে আরো বিষময়।

এই বুড়ো বাউণ্ডুলে, পায়ে ঠেলে কাদার ফাগুয়া,
উন্নাসিক, তৃপ্তিহীন, স্বপ্ন তার অপ্সরীর দিঠি,
মন্ত্রমুগ্ধ চোখে চেয়ে ছাখে তবু ভাস্বর কাপুয়া [২]
যেখানেই বস্তির ধোঁয়াটে বাতি জ্বলে মিটিমিটি!

৩

অদ্ভুত যাত্রীর দল! তলহীন, সমুদ্রের মতো,
বিলোল নয়ন ভ'রে নিয়ে এলে প্রোজ্জ্বল কাহিনী ;
স্মৃতির তোরঙ্গ খুলে দেখাও, সেখানে আছে কত
নীলিমার, নক্ষত্রের মণিহার, মুকুট, কিঙ্কিণী।

আমরাও যাবো দূরে, বিনা পালে, বায়ুব্যতিরেকে—
আমরা, আজন্ম বন্দী, বক্ষে চাপা নির্বেদের ভার,
অকস্মাৎ উন্মোচিত আত্মার বনাতে দাও এঁকে
দিগন্তের চালচিত্রে পুলকিত স্মৃতির সম্ভার।

বলো, বলো, কী দেখেছো, বলো!

২। Capua : দক্ষিণ ইটালির শহর, বর্তমানে নগণ্য, কিন্তু রোমক সাম্রাজ্যের সময়ে কাম্পনিয়া প্রদেশের প্রধান নগররূপে ঐশ্বর্য এবং বিলাসিতার জন্য বিখ্যাত ছিলো।

৪

"দেখেছি অপরিমেয়
আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ, বালুতট তরঙ্গপ্রহত ;
এবং অচিন্তনীয় প্রলয়ের সংঘাত সত্ত্বেও
মাঝে-মাঝে হৃদয় হয়েছে ক্লান্ত, তোমাদেরই মতো।

বেগনি-রঙা সমুদ্রে মহান সূর্য কেলিপরায়ণ,
গরীয়ান অস্তরাগ নগরের উচ্ছল বিলাসে,
দেখে-দেখে চেয়েছে আবেগদীপ্ত শান্তিহীন মন
ডুবে যেতে লোভন বিচ্ছুরণে রঙ্গিল আকাশে।

রমণীয় বনপথে, নগরের সমৃদ্ধ প্রাসাদে
কখনো স্পর্শেনি সেই রহস্যের গম্ভীর আবেগ,
যা পেয়েছি পুঞ্জিত মেঘের মধ্যে, দৈবের প্রসাদে ;
আর ছিলো হৃদয়ে অনবরত কামের উদ্বেগ !

—পুলকের অভ্যুদয় কামনার বাড়ায় ক্ষমতা।
হে কাম, প্রাচীন বৃক্ষ, সুখময় তোমার প্রান্তর,
যদিও বল্কলে বাড়ে দিনে-দিনে কঠিন ঘনতা
ডালপাখা ঊর্ধ্বে উঠে সূর্যেরেই খোঁজে নিরন্তর।

বনস্পতি, বৃক্ষরাজ, সাইপ্রেসের চেয়ে দীর্ঘজীবী,
অনন্তবর্ধিষ্ণু তুমি ?—যত্নে তবু করেছি চয়ন
ক্ষুধাতুর তোমার পুঁথির যোগ্য কতিপয় ছবি,
আমরা, দূরত্বমুগ্ধ, সৌন্দর্যপিয়াসী ভ্রাতৃগণ।

দেখেছি অবাক চোখে শিং-তোলা বিরাট প্রতিমা,
নক্ষত্রপুঞ্জের মতো সিংহাসনে রত্নের সম্পাত,
উৎকীর্ণ প্রাসাদ, যার জাদুকর কান্তির গরিমা
জোগাতে, ধনপতির সর্বনাশ হবে অচিরাৎ ;

বসন, দর্শনমাত্রে, ব্যাপ্ত করে মদির আবেশ,
মোহিনী রমণীদের বর্ণলিপ্ত নখর, দশন,
সাপুড়ের কণ্ঠ ঘিরে সাপিনীর নিবিড় আশ্লেষ।"

৫

তারপর, বলো, তারপর ?

৬

"হায় রে অবোধ মন !

সার কথা শোনো তবে, সনাতন, অবিস্মরণীয়,
ঊর্ধ্বে, নিম্নে সোপানের যত আছে মারাত্মক ধাপ,
সর্বত্র দেখেছি শুধু—সাধ ক'রে খুঁজিনি যদিও—
ক্লান্তিহীন মঞ্চে খেলে ক্লান্তিকর, মৃত্যুহীন পাপ :

রমণী, আজন্ম দাসী, হাস্যহীন, দাম্ভিক, নির্বোধ,
কিছুতে ন্যক্কার নেই—আত্মরতি, আত্মোপাসনায় ;
পুরুষ, লম্পট, লুব্ধ, অত্যাচারে নেয় প্রতিশোধ,
দাসীর দাসত্ব করে নর্দমার ক্লেদাক্ত ঘেন্নায়।

শহীদ, ক্রন্দনে রত, আনন্দিত, সপ্রেম ঘাতক,
রক্তের সৌরভ মাখা উৎসবের মত্ত আয়োজন,
শক্তির কুটিল বিষে অবসন্ন লোকাধিনায়ক,
চাবুকের আকাঙ্ক্ষায় জনগণ নতিপরায়ণ ;

অনেক আশ্রম, ধর্ম, সিঁড়ি ভেঙে স্বর্গে ধাবমান,
আমাদেরই অনুরূপ ; যাকে বলে পুণ্যের প্রভাব,
তাও, যেন ভোগক্লান্ত পালকের শয্যায় শয়ান,
কণ্টকিত চটেও প্রকট করে কামুক স্বভাব।

প্রগল্‌ভ মানুষ, তার প্রতিভার পীড়নে মাতাল—
সঙ্গী তার অচিকিৎস্য, চিরায়ত চিত্তের বিকার—
বিধাতারে জানায় যন্ত্রণা, ক্ষোভ, আক্রোশে উত্তাল :
"তবে নাও অভিশাপ, প্রভু আর প্রতিভূ আমার !"

আর যারা কিঞ্চিৎ সজ্ঞান, তারা কঠিন সাহসে
জাড্যেরে জানায় প্রেম ; অদৃষ্টের শৃঙ্খলে নাচার,
ডোবে, গড্ডলিকা ছেড়ে, আফিমের বিশাল প্রদোষে
—আশ্বস্ত জগৎময় চিরন্তন এ-ই সমাচার।"

৭

অতি কটু সেই জ্ঞান, চক্রমণে যারে যায় পাওয়া,
একতাল, সংকীর্ণ এ-পৃথিবীর আকাশে, বায়ুতে
আজ, কাল, চিরকাল খেলে শুধু আমাদেরই ছায়া,
আতঙ্কের মরূদ্যান নির্বেদের বিস্তীর্ণ মরুতে।

যাবেই ? পারো তো ঘরে ব'সে থাকো, আর
যদি না-গেলেই নয়, যাও, ছোটো, কিংবা দাও হামা,
ফাঁকি দাও শত্রুরে, নিস্পন্দ চোখে যে করে সংহার—
সময় ! হায় রে যাত্রী, ধাবমান, নেই তার থামা,

অস্থির ইহুদি যেন, কিংবা পীর, ধর্মের যাজক,
কিছুই পাথেয় নেই, অশ্ব, রথ, কিংবা জলযান,
এ-কুৎসিত মল্লেরে পলাবে ব'লে নিয়ত ব্রাজক ;
অন্য কেউ আঁতুড়েই শিখে নেয় তার মৃত্যুবাণ।

অবশেষে যখন পা দিয়ে চেপে, ছিঁড়ে নেবে টুঁটি,
সাধ্যে তবু কুলোবে আশার বাণী : হও আগুয়ান !
যেমন ভেসেছিলুম, পুরাকালে, উপড়ে ফেলে খুঁটি,
সুদূর চৈনিক তটে, শ্রস্ত কেশ, নিবদ্ধ নয়ান।

এবার তাহ'লে যাত্রা তমসার অতল সাগরে,
সত্ত্ব-পথিকের মতো পুলকিত হৃদয় উধাও,
শোনো, কারা শবযাত্রী গান গায় মোহময় স্বরে :
"এদিকে, এদিকে এসো, যদি কেউ স্বাদ নিতে চাও

মদগন্ধ কমলের। এই হাটে তারে যায় কেনা,
যে-অলোক ফলগুচ্ছে নিত্য ঝরে ক্ষুধার ফোয়ারা ;
এখানে প্রদোষ নেই, অপরাহ্ণ আর ফুরোবে না,
এসো না, মাধুরী তার পান ক'রে হবে মাতোয়ারা।"

ওপারে বাড়ায় বাহু পিলাদিস,[৩] এখনো তেমনি,
প্রেতেরে চিনিয়ে দেয় পুরাতন গানের গুঞ্জন।
"সাঁৎরে ধর ইলেক্ট্রাকে, সে-ই তোর বিশল্যকরণী!"
বলে সে, একদা যার জানুতট করেছি চুম্বন।

৮

হে মৃত্যু, সময় হ'লো! এই দেশ নির্বেদে বিধুর।
এসো, বাঁধি কোমর, নোঙর তুলি, হে মৃত্যু প্রাচীন!
কাণ্ডারী, তুমি তো জানো, অন্ধকার অম্বর, সিন্ধুর
অন্তরালে রৌদ্রময় আমাদের প্রাণের পুলিন।

ঢালো সে-গরল তুমি, যাতে আছে উজ্জীবনী বিভা!
জ্বালো সে-অনল, যাতে অতলান্তে খুঁজি নিমজ্জন!
হোক স্বর্গ, অথবা নরক, তাতে এসে যায় কী-বা,
যতক্ষণ অজানার গর্ভে পাই নূতন—নূতন!

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

৩। Pylades : গ্রীক পুরাণে অরেস্টেস-এর বন্ধু। অরেস্টেস যখন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়ে ভগিনী ইলেক্ট্রাকে উদ্ধার করেন, পিলাদিস ছিলেন তাঁর প্রধান সহায়। মৃতের দেশে পিলাদিস বন্ধুতার প্রতীক, আর ইলেক্ট্রা কমনীয় নারীত্বের।

ফরাসী কবিতা

অনুবাদ : বিষ্ণু দে

শার্ল দুক্ দ'রলেআ : রঁদেল

পালান সব এখান থেকে পালান,
দুশ্চিন্তা দুঃখ জ্বালা যতো!
আমার সারাজীবন অবিরত
দাবড়ে রেখে চলবে খানদান?
জানিয়ে দিই; যদ্যপি না যান,
যুক্তি এসে করবে পদানত,
পালান সব এখান থেকে পালান।

আবার যদি দেখান পিছুটান
মশায়দের কেউ বা অপগত,
ঈশ্বরকে ডাকব, শাপাহত
সবাই হোন, মাগব বরদান,
পালান, সব এখান থেকে পালান॥

ফ্রাঁসোআ ভিলঁ : লে. বা বরং রঁদো

মরণ, কাঁদালি নিষ্ঠুরতার জোরে,
নিয়েছিস তুই আমার প্রিয়ার প্রাণ,
তাতেও কি তোর অতৃপ্তি অম্লান?
আমার সকল শক্তি যে যায় ম'রে,
এনেছিস আঁধি আমার বিষাদঘোরে,
সে বাঁচলে তোর কিবা হত লোকসান,
মরণ?

দুজনে ছিলাম একটি হৃদয়ডোরে,
সে মৃত, আমিও মরণে মুহ্যমান,
দেউলে খোদাই সন্ত সাধু সমান
বেঁচে কিবা লাভ, জীবনই নেই যে ওরে
মরণ !

পিএর রঁসার : সনেট

যখন অত্যন্ত বৃদ্ধা হবে তুমি, সাঁঝের বাতিতে
নক্সিকাঁথা বুনে যাবে অন্যমনে, অন্দরে আসীন
গুঞ্জরি আমার গান বলবে, 'হায়রে সেই দিন
যখন বয়স ছিল গাইত রঁসার আরতিতে !'
তোমার সঙ্গিনী যতো শোনামাত্র, এই কথাটিতে
অকৃত কর্তব্য ভুলে যাবে, হবে ক্লান্তিও বিলীন,
উঠবে চকিত হ'য়ে, পুণ্যবতী তুমি মৃত্যুহীন
প্রাতঃস্মরণীয়া ব'লে পূজা দেবে তোমায় ভক্তিতে।

সে সময়ে মৃত্তিকার নিচে আমি নিদ্রার সন্তাপে,
করবীর পত্রছায়ে আমি শুধু ছায়া একখানি,
ওদিকে তখন তুমি দীপালোকে জরতী বড়ায়ী
তোমার যৌবনগর্ব ভাবো মনে স্মৃতির বিলাপে—
বরঞ্চ ভালোইবেসো, এখনও সময় আছে জানি,
বর্তমান আজও হাতে, এসো তুলি গোলাপ ছড়াই ॥

শার্ল বোদলেয়ার : মাতাল হও

সব সময়ে মাতাল হ'তে হবে। ওতেই সব : ঐ একমাত্র বিবেচ্য। যদি বোধ করতে না চাও মহাকালের ভয়ানক ভার, যাতে তোমার ঘাড় ভেঙে যায় আর তুমি বেঁকে পড়ো মাটির দিকে, তবে তোমাকে মাতাল হ'তে হবে অবিরাম।

কিন্তু কিসে ? মদে, কবিতায়, সৎকার্যে, তোমার যা রুচি। কিন্তু মাতাল হও।

এবং যদি কখনও, প্রাসাদের সিঁড়িতে, বা নালার সবুজ পাড়ে বা তোমার ঘরে নিরানন্দ নৈঃসঙ্গ্যে জেগে ওঠো আর মাতালপনাটা কমেছে বা চ'লে গেছে দেখ, তখন জিজ্ঞাসা কোরো বাতাসকে বা ঢেউকে বা তারাকে বা পাখিকে বা ঘড়িকে, যা-কিছু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বা ওড়ে বা দোলে বা গায় বা কথা কয়, জিজ্ঞাসা কোরো কটা বেজেছে, দেখবে তুমি জবাব পাবে : "এই তো মাতাল হবার সময়। মাতাল হও, যদি না মহাকালের পায়ে উৎসর্জিত দাস হতে চাও, মাতাল হও অবিশ্রাম। মদে, কবিতায় বা সৎকার্যে, যা তোমার রুচি।"

বৌ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

কোথাও এমন বিন্দু নেই
যেখানে থেমেছে এসে প্রাণের কলঙ্কী ইতিহাস,
সমুদ্রের গান শোনে সাইক্লোনে ঘাস।
কোথাও পাপের ক্ষয় রাখেনি তেমন কিছু পরিচ্ছন্ন খেই
পাবকের মতো, যার নীল বাহুপাশ
পাবো নদ-নদী-হ্রদ-সমুদ্র-সিনানে।
তবু অস্নাতক দিনে খুঁজে নিতে হয় যদি না-থাকার মানে
তোমাকে দেব না আমি যেতে
কোনো বিবাহিত-রাত্রি-ঝলসানো আগুনের ক্ষেতে
পাছে আলোকিত ক্ষণে ক্ষত মুখ পাও
যা তুমি, অথবা হতে পারে মায়া-সবুজ কন্যাও
যা তুমি অনেক জন্মে ছিলে
আমি ঊনপঞ্চাশের ফলতরু পঞ্চডাল নীলে!

সন্ধ্যা যখন নামলো

আরতি আচার্য চৌধুরী

তন্বী সন্ধ্যা পরলো
হলুদ আলোর রেশমি
পাৎলা কোমল কাঁচুলি।
চুলের গুচ্ছে গাঁথলো
শুভ্র রজনীগন্ধা।

আঁট ক'রে বেঁধে
রক্ত আঁচল
সোনা-মাখা ধানে
নামলো।

খড়ের ছোট্ট ঘরে
ওঠে রান্নার ধোঁয়া—
সেখানে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা,
চোখে সুন্দর স্বপ্ন।

বাঁকানো আলের ধারে
উৎসুক চোখ নাচে
সন্ধ্যা যখন লাউ-মাচা বেয়ে
ধীরে এসে ঘরে থামলো।

তখন অন্য কোথাও,
পোকা-পড়া মেয়েগুলো
ঠোঁটে, গালে রং মেখে
তীব্র চাবুক হানলো
ময়লা হাওয়ার গলিতে।

কেউ হাত ধ'রে
টেনে নেয় ঘরে
পঙ্গু বৃদ্ধ কুলিকে।

করুণ ক্লান্ত ছায়া
রাত্রির চোখে ঝরলো।

দুটি কবিতা

সৈয়দ শামসুল হক

দুইজন

চুপ ক'রে থাকে সে আড়ালে

হাজার মনের ভিড়ে কখন যে ফোটে
রাত্রির ফুলগুলো লাজুক, অবুঝ,
এক মন উন্মন করে

রাত আসে পাশাপাশি
সোনালি নদীরা বয় দুজন বিজনে

একজন যন্ত্রণায় কাঁপে

একজন থাকে সে আড়ালে ॥

স্টাডি

আকাশে আলতো আঁকা মিষ্টি বিকেল
উদ্বেল হ'লো কার বুক ?
আকাসিয়া পপলারে আকাশের রেখা টানে
বিস্ময়ে ছায়া ওড়ে বক

পুরোনো হ্রদের পাড়ে : গভীর চোখের মতো
ছায়া কাঁপে বক।

ডিভনশিয়র থেকে ব্যাচিলর বিলেতি সাহেব
বিকেলি সৌরভ মেখে মেহগেনি ছড়ি হাতে
নাবলেন, ভাবলেন,

হয়ত সে এসেছিল স্বপ্নরেণু মন
অথবা সে এসেছিল বাতাস যেমন
এমনও তো হতে পারে কোনোদিন আদৌ আসে নি।

বিকেলের রমনায় বিলেতি সাহেব
হাই তোলে, যাক—হোটেলে পাঁচটা বাজে
মিসেস্ ম্যাকেন্টার ককটেল কিছুক্ষণ পরে :

এদেশ ওদেশ জুড়ে সেই এক নিশ্চল আকাশ ॥

দুটি কবিতা

সুকুমার রায়

বাগানবাড়ি

মন মানে না নদীর কালো চোখ
নৌকোগুলো অমন কেন করে ?

অমন কেন মন
কাঁপছে যেন কথার কালো ঝড়ে—
দুলকি চালে ওড়ে আলোর ঝাড়,
দুলতে থাকে মায়ার সংসার ;
কোথায় এক জানলা ভেঙে পড়ে।

বাগানবাড়ি চলছে তাড়াতাড়ি,
নৌকোগুলো অমন কেন করে ?

ভুলি নি

ভুলি নি !
ধুলোয় ধোঁয়ায় আলোয় ছায়ায়
রেলিঙে হেলানো তুমি
ভুলি নি।

দুটি কবিতা

প্রতিমা পাল

বিকেল

নীল বিকেল।
একা বসে আছি ঘাসের ওপর।
সোনা-গলা রোদে ঘুমের গান,
পলাশ গাছটায় ধরেছে অনেক ফুল,
লাল তাদের রঙ।
দূরে স্কুলের পেটা ঘড়িটায় পাঁচটা বাজলো।

মাটির নরম বুকে
ঝিরঝির ক'রে কাঁপছে গোধূলির গন্ধ।
রাত্রির লোভী স্পর্শ এখনি সেটুকু নেবে লুটে,
কালো থাবায় সবুজের শব্দ যাবে মিলিয়ে।
তবু আমার ভালো লাগে এই প্রতীক্ষা
ভালোবাসি রোদের শেষ চুমোয় নিজেকে ভ'রে তুলতে
এই নীল—নীল বিকেলে।

রাত্রিশেষে

বাইরে নেমেছে বৃষ্টি,
বড়ো-বড়ো ফোঁটায় প্রাণের স্পন্দন,
পিচ-ঢালা রাস্তার ওপর গ'লে পড়ছে
নক্ষত্রের কান্না।
তুমি ঘুম থেকে উঠে এলে আমার পাশে
প্রদোষের অন্ধকারে ভেজা তোমার চোখ,

তোমার চুলের গন্ধে মুখ ঢেকে বললাম—
"আজ তুমি যেয়ো না।"
পিঠে হাত রেখে বললে—"আমার যে কাজ।"
কারখানার বাঁশি বেজে উঠলো।
স্বপ্ন ভেঙে
দরজা খুলে তুমি বেরিয়ে গেলে।

সে-মেয়ে

গোপাল ভৌমিক

দুটি হৃদয়ের সেতুবন্ধন পেরিয়ে
সে-মেয়ে এসেছে ধীরে
কৌতূহলের উদ্যত চোখ এড়িয়ে
ঘাসের এবং তারার এবং তোমাদের—
সেই মেয়ে আর আমি হয়ে গেছি
সাধক, সুরের সাধনের।

দেখিনি শ্যামল পল্লীতে তাকে
কিংবা মুখর এ মহানগরে ;
কল্পলোকের ছায়ানটী হয়ে
তবু সে বাঁচে ও মরে,
হাসায়, কাঁদায়, ভালোবাসে, ঘৃণা করে—
সে রয়েছে, তাই গানের শ্রাবণ ঝরে।

সে-মেয়ে, জানি, অনন্যা ;
ইতিহাস তার নাগাল পায় না খুঁজে :
সে নয় দিনের, রাত্রির নয়,
শুধু সে লগ্ন বুঝে
গভীর গোপনে হৃদয়ে লাগায় দোলা—
সৃষ্টির ক্ষণবিদ্যুতে আমি তখনই আত্মভোলা।

উড়ো তর্ক

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

তবে শোন বলি তোরে : কেন তুই ভিটেমাটি ছেড়ে
চ'লে এলি এই হিংস্র জটিল নগরে ? টাকাকড়ি
যা ছিল খোয়ালি সব, যতই না আস্ফালন করি,
জুয়াড়ি দিনের কাছে বারংবার যাই না কি হেরে ?

তবু এলি, তবু এলি দেশ ছেড়ে এ কোন বিদেশে
আবার বাঁধবি বাসা এই ভেবে। শহরের শিলাস্তূপে
কোথায় সে গ্রামান্তের নীল ! তীব্র আকাঙ্ক্ষার যূপে
মাথা রেখে শিলাসনে দেহরক্ষা হ'লো অবশেষে।

তুই এলি, তুই গেলি। সহস্রের ভিড়েই খোয়ালি
পুষ্পিত আশার চিহ্ন ; গাড়ি, ঘোড়া, পদাতিকে ভারি
এ শহরে কেন এলি ? কোন মুখে দিলি চুনকালি
শিলায়িত সভ্যতার, উদ্বাস্তু কি এতই আনাড়ি ?

সব চেয়ে বড়ো লজ্জা : তোর বউ আলুথালু বেশে
বুক চাপড়িয়ে কাঁদে, তারপর ওঠে হো-হো হেসে॥

দুটি কবিতা

শামসুর রাহমান

নির্জন দুর্গের গাথা

মানিনি জীবন সমুদ্রসন্ধানে
চোরাবালিতেই পরম শরণ নেবে।
আশার পণ্যে পূর্ণ জাহাজ সে-ও
ডোবা পাহাড়ের হঠকারিতায় ঠেকে
হবে অপহৃত—ভাবিনি কখনো আগে।

দিনের সারথি বল্গা গুটিয়ে নিলে,
যখন রাত্রি কৃষ্ণ কবরী নেড়ে
আনে একরাশ তারা-ফুল থরথর,
দু'হাতে সরিয়ে শ্যাওলার গাঢ় জাল
চমকে তাকাই আমিও মজ্জমান।

ভবিষ্যতের ঝাঁপির অন্ধকারে
যা-কিছু রয়েছে আমার জন্যে শেষে
সবি নিতে হবে দৈবের দয়া মেনে।
ব্যঙ্গদৃষ্টি আড়ালেই ঝলসায়।

নির্জনতার কারাগারে সঁ'পে প্রাণ
আত্মদানের মহৎ দুর্গ গড়ি।
যদি সে প্রাকারবিরোধী অশ্বখুরে
অচিরাৎ তার দৃঢ় নির্ভর ভোলে,
যদি দর্পের দর্পণ হয় গুঁড়ো,
ঝড়ের সামনে ভাগ্যের শাখা মেলে,

কাকে পর ভেবে কাকে বা আপন জেনে
সাধের শ্রমেরে দিব যে জলাঞ্জলি!

যদি হ'তো ঐ তারাদের মতো চোখ
তারার মতন নিবিড় লক্ষ কোটি,
দু'দিনের ঘরে হয়তো পেতাম তবে
বেলা না ফুরোতে তাকে এই চরাচরে
চোখের তৃষ্ণা মিটিয়ে দেখার সুখ।
অবুঝ আমার আশা উদ্বাহু তবু।

বিরূপ লতার গুচ্ছে জড়িয়ে শিং
কালো রাত্তিরে তৃতীয় প্রহরে একা
কাঁদে প্রত্যহ হরিণ-হৃদয় যার
তাকে নেব চিনে: প্রাণের দোসর সে-যে।

সম্মুখে কাঁপে অমোঘ সর্বনাশ।
দিনের ভস্ম পশ্চিমে হয় জড়ো,
অনেক দূরের আকাশের গাঢ় চোখে
রাত্রি পরায় অতল কাজল তার।
এমন নিবিড় স্মৃতি-নির্ভর ক্ষণে
বলি কারো নাম, হৃদয়ের স্বরে বলি।
জলি অনিবার নিজেরই অন্ধকারে।

এতকাল ধ'রে আমার আজ্ঞাবহ
ঘাতক রেখেছে তীক্ষ্ণ কুঠার খাড়া,
সেই যূপকাঠে নিজেই বলির পশু।

উঁচু মিনারের নির্জনতায় ম'জে
ভেবেছি সহজে বিশ্বের মহাগান
আমার প্রভাতে সন্ধ্যায় আর রাতে
ঝর্নাধারায় আনবেই বরাভয়।
সেই বাসনার প্রভূত জাবর কেটে
শূন্যে ছুঁড়েছি দুরাশার শত ঢিল।

প্রতি পক্ষের কূটচক্রের তান
পশেনি কর্ণে, ওদের বর্ণবোধে,
সান্ধ্যভাষায় করিনিকো দৃক্‌পাত।
কবন্ধ যারা নিত্য জন্মাবধি
অন্ধের মতো তাদের যষ্টি ধ'রে
দ্বন্দ্বের ঘোরে ছুঁইনি গতির বুড়ি।

বিরস গান

ইচ্ছা আর অনিচ্ছায় জীবনভোর কলম ঠেলে
হায়রে তুমি কী-ই বা পেলে?
দিনরাত্রি পুঁথির শত পাহাড় খুঁড়ে দেখলে শেষে
পোড়া কপাল! মূষিক মেলে।
কালের মেঘে অকাল সাঁঝ নিমেষে এলো হঠাৎ ভেসে:
দেখলে শেষে যৌবনের পরম গতি নিরুদ্দেশে।

প্রেতের মতো একাকীত্বে সব পন্থা খুইয়ে এসে
কন্থা গায়ে বলবে কাকে মহান প্রভু?

যাকেই বলো হারানো গান পাবে না তবু।
কঠিন পথে আশার রথ তাড়িয়ে দ্রুত কোথায় এলে ?
কার সে হাতে আত্মা সঁ'পে
জীবনভোর ভীষণ সেই নামটি জ'পে।
মনের যত হঠকারিতা গুঁড়িয়ে ফেলে
হায়রে তুমি কী-ই বা পেলে ?

বোদলেয়ার অবলম্বনে

বুদ্ধদেব বসু

কয়েকটি বিষ

মদের নেশা লুকিয়ে রাখে নোংরা গলি
অলৌকিকের বর্ণচোরা ঝলসানিতে,
খেয়ালি তার রঙিন ফেনার তলানিতে
ভেসে ওঠে তোরণ জুড়ে দীপাবলি
অন্তরাগের রশ্মি-জ্বলা কাহিনীতে।

আফিম আনে সীমাহীনের সম্ভাবনা,
দীর্ঘ করে মুহূর্তের চলার তালে ;
ঘণ্টা হয় গভীর, তার রত্ন ঢালে।
হৃদয়, সুখে ক্লান্ত হ'য়ে, উন্মাদনা
নিংড়ে নেয় ধূসরিমার অন্তরালে।

এরাও নয় তার কাছে এক কানাকড়ি,
সবুজ চোখে হেলায় তুমি ছাঁকো যে-মদ,
এই হৃদয়ের ডুবে মরার অতল হ্রদ ;
এগিয়ে মাথা, বেপরোয়া ঝাঁপিয়ে পড়ি,
স্বপ্ন মেটে, দীর্ঘশ্বাসের দেনাও রদ।

কিন্তু তোমার নিষ্ঠীবনের নেই তুলনা—
বেঁধায় হুল, ধরায় জ্বালা। সকল মন
বিস্মরণের অমায় করে সমর্পণ,
জীবন ভ'রে জমিয়ে-তোলা সব ভাবনা
তরঙ্গিত প্রলয়ে দেয় বিসর্জন।

ন্যাকড়া-কুড়ুনির মদ

বস্তির সর্পিল পথে বার-বার তারে যায় চেনা—
যেখানে কৃমির বংশ উগরে তোলে বিষময় ফেনা
পঙ্কিল পল্বলে, আর মধ্যরাতে তীরন্দাজ হাওয়া
ল্যাম্পোস্টেরে নাড়া দিয়ে ঢেলে দেয় রক্তবর্ণ ছায়া—

জজিয়তি ভঙ্গিতে সে মাথা নাড়ে, ন্যাকড়া কুড়ায়,
রাজত্বে অপ্রতিহত, তুচ্ছ করে নৈশ পাহারায় ;
দেয়ালে ঠোক্কর খেয়ে, কবিদের মতো অন্যমনা,
শুরু করে বাগ্মিতার মহাপ্রাণ, ভাস্বর সাধনা ;

নেয় রাজ-শপথ, দেয় জনগণে মঙ্গল-সংহিতা,
দুঃস্থে দান, দুর্জনের নিপীড়নে খ্যাতিমান পিতা—
আকাশে আস্তীর্ণ তার প্রভাবের প্রামাণ্য সভায়
নিখিলনক্ষত্র, ছাখে, দীপ্ত তারই পুণ্যের প্রভায়।

তা-ই বটে ! এরা সব, শতচ্ছিন্ন সংসারের চাপে,
পিষ্ট হ'য়ে পরিশ্রমে, বার্ধক্যের অকালসন্তাপে,
নুয়ে-পড়া কাঁধে তুলে কদর্যের স্থূল সঞ্চয়ন—
অতিকায় প্যারিসের অনর্গল, বিচিত্র বমন—

ঘরে ফেরে, পিপে-গন্ধী গরিমার স্মরণে উজ্জ্বল,
সঙ্গে নিয়ে বয়োবৃদ্ধ পিতামহ-বান্ধবের দল—
যাদের গুম্ফের স্রোত পদক্ষেপে পতাকা ওড়ায়।
—মায়াময় বিচ্ছুরণে অকস্মাৎ সম্মুখে দাঁড়ায়

মশাল, ফুলের মালা, বলীয়ান বিজয়-তোরণ ;
প্রত্যাবর্তনের পথে অঙ্গুলিপ্ত মঙ্গলাচরণ
ঢাক, ঢোল, বাঁশির উচ্ছ্বাস তুলে, উষার উত্থানে
ভ'রে দেয় প্রেমের নেশায় মত্ত ক্ষিতির সম্মানে।

জীবনের প্রহসনে, এইমতো, দিগন্তে ছড়ায়
মদিরা, সোনায় মাখা পাক্তলস,[১] প্রোজ্জ্বল ধারায়।
মানবের কণ্ঠে তার ক্ষমতার সাক্ষাৎ রটনা,
দানপুণ্যে রাজত্ববিস্তার তার সামান্য ঘটনা।

সুষুপ্তি, আলস্যে স্নিগ্ধ, বিস্মৃতির অমল কন্দর,
ঝড়ে-ভাঙা দুর্ভাগার নির্বাণের অস্থায়ী বন্দর—
অনুতপ্ত ধাতার সৃষ্টি সে ; আর মানুষের দান
মদিরা, স্বর্গের স্বাদ, মৃত্যুহীন, সূর্যের সন্তান।

নিঃসঙ্গ মানুষের মদ

যেমন, অচ্ছোদ হ্রদে, প্রতীক্ষার নিস্পন্দ নিচোল
দুলে ওঠে স্নানার্থিণী চন্দ্রমার মৃদু শিহরণে
অলস অঙ্গের ভঙ্গে, লাস্যময়, চঞ্চল কিরণে—
সেইমতো প্রমদার কামারুণ কটাক্ষ বিলোল ;

জুয়াড়ির হাতে শেষ, অবশিষ্ট গোটা কয় টাকা,
ক্ষীণাঙ্গী আদেলিনার মদকল-বিহ্বল চুম্বন ;
স্মরণে চিরায়মান সনির্বন্ধ সুরের বলাকা,
যার বুকে মানবের অবিকল দুঃখের গুঞ্জন ;—

[১] Pactolus (গ্রীক Pactolos) : গ্রীক পুরাণে বর্ণিত নদী, যার বালু স্বর্ণরেণুতে অনুলিপ্ত।

এরা নয় সমকক্ষ, হে গভীর, সুহৃদ্ বোতল,
তোমার উদরচ্যুত, দূরাবলেহন চিকিৎসার,
পুণ্যাত্মা কবির প্রাণে সান্ত্বনার অক্লম উৎসার—

তুমি দাও দুরাশা, নবজীবন, যৌবনের বল,
এবং গৌরব, যার বরমাল্যে আমরা ভিখারি
হ'য়ে উঠি দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী, স্বর্গের শিকারি।

প্রেমিক-প্রেমিকার মদ

সকল দিক আজ মাধুরীময় !—
অবাধ, অবারণ, অসংশয়,
আমরা মদিরার অশ্বারোহী,
অলোক দ্যুলোকের দিগ্বিজয়ী !

যুগল দেবদূত, অনির্বাণ
জ্বরের যাতনায় বেপথুমান,
ভোরের নীলিমার স্বচ্ছকায়
স্ফটিকে খুঁজি দূর মরীচিকায়।

পুলকে প্রতিযোগী পরস্পরে—
আমরা সমতায় স্পন্দহীন
চেতন ঝর্ণার পাথার 'পরে ;—

বোন আমার, বল, বন্ধহীন
পাগল গতি এই কোথায় থামে ?
—স্বপ্নে-পাওয়া বৈকুণ্ঠধামে !

গহ্বর

পাস্কেল, জগৎ জুড়ে, দেখেছেন কেবল গহ্বর।
সব যেন তলহীন—বাক্, স্বপ্ন, উদ্যম, বাসনা !
আমিও অনেক বার জেনেছি সে-বিকট যাতনা
উল্লম্ব মাথার কেশে, আতঙ্কের বাতাসে জর্জর।

ঊর্ধ্বে, নিম্নে, দশ দিকে, নেমে যায় অবিরল খাদ,
সীমান্ত, নিঃশব্দতা, নীলিমার ভয়াল বন্ধন।
রাত্রির নেপথ্যে দেখি ঈশ্বরের অঙ্গুলি-লেখন
এঁকে যায় বহুরূপী দুঃস্বপ্নের অনন্ত বিষাদ।

ঘুমেও নিস্তার নেই, বিরাট গর্তের মতো সে-ও,
ভ'রে আছে অস্পষ্ট বিভীষিকায়, উদ্দেশ্যবিহীন,
অসীমেরে নগ্ন ক'রে খুলে দেয় সকল জানালা।

তাই তো আমার আত্মা, অবিরাম মূর্ছায় বিলীন,
ঈর্ষা করে অজ্ঞান শূন্যেরে, চায় সুমিত, সুমেয়
সত্তা, সংখ্যা, বাস্তবের মুক্তিহীন মায়ার শৃঙ্খলা।

ঢাকনা

মানুষ যেখানে যাক, সিন্ধুপারে, কিংবা আরো দূরে,
অগ্নিময় নভতলে, কিংবা যেথা তপন তুহিন,
দিক সে পূজার অর্ঘ্য আফ্রোদিতে অথবা যীশুরে,
কনকে ভাস্বর, কিংবা দারিদ্র্যের বিবরে মলিন ;

নাগরিক, বাউণ্ডুলে, গ্রাম্যজন, গুরুমহাশয়,
হোক তার মস্তিষ্ক মন্থর, ক্ষিপ্র, কিংবা ক্ষুরধার—
চরাচরে পরিব্যাপ্ত এই এক অন্তহীন ভয়,
ঊর্ধ্বে যদি চক্ষু তোলে, হৃৎপিণ্ড কেঁপে ওঠে তার।

ওখানে আকাশ, এই কুঠুরির ক্রূর শামিয়ানা,
বিতরে প্রগল্‌ভ মঞ্চে আলোকের চঞ্চল নিশানা,
মেতে ওঠে রক্তে পাঁকে প্রহসন-পুত্তলির দল ;

লম্পটের বিভীষিকা, তপস্বীর অলীক মাধুরী—
কটাহ-ঢাকনার নিচে মানবেরা দেবে হামাগুড়ি,
তার ঊর্ধ্বে অভীপ্সার অবরুদ্ধ সকল অর্গল।

ধ্বংস

নিত্য সে আমার পাশে, বাতাসের মতো নিরঙ্কুশ,
বেড়ায়, সাঁতার কাটে, কাৎরে ওঠে, অতনু শয়তান ;
সে আমার পানীয়, প্রদাহময় বিষাক্ত ফুশফুশ,
হতাশা, দুরভিসন্ধি, যন্ত্রণার উৎস অফুরান।

মাঝে-মাঝে, শিল্পের প্রেমিক আমি জানে ব'লে, নেয়
নারীর মোহিনী মূর্তি : এই মতো, কপট কৌশলে
আমারে সে মজিয়েছে তিলে-তিলে, কানায়-কানায়,
অকথ্য মকরধ্বজে, নরকের লোলুপ কোহলে।

কিছুই রাখেনি বাকি ;—ধাবমান আমার ক্লান্তিরে
ভুলিয়ে, অনতিক্রম্য, জনহীন, গভীর প্রান্তরে—
যেখানে ঈশ্বর নেই, আছে শুধু নিঃসীম নির্বেদ—

দেয় সে আমারে ছুঁড়ে পদে-পদে বরণের ডালি,
মশানের রক্ত-মাখা নোংরা, ছেঁড়া ন্যাকড়ার ফালি,
ধ্বংসের সকল অর্ঘ্য—ভ্রান্তি, ত্রাস, অরুন্তুদ ক্লেদ।

রোমান্টিক সূর্যাস্ত

কী সুন্দর সূর্যের জ্যোতির্ময়, নম্র বিস্ফোরণ,
আকাশেরে যখন রাঙিয়ে দিয়ে নেয় সে বিদায় ;
ধন্য সে, যে সূর্যাস্তে ডুবিয়ে চোখ, সোনার বরন
অন্তিম রশ্মির প্রেমে নুয়ে পড়ে মুগ্ধ বন্দনায়।

তার সেই দৃষ্টিপাতে, আত্মহারা হৃদয়ের মতো,
দেখেছি, মূর্ছায় ঝরে ফুল, জল, মাটির ফাটল।
চলো দিগন্তের দিকে। বেলা যায়। এখনো—হয়তো—
খুঁজে পাবো অন্তরাগে লীয়মান আলোর অঞ্চল।

কিন্তু না, বৃথাই ছোটা ! অপসৃত আমার ঈশ্বর।
রাত্রি, অপ্রতিরোধ্য, স্যাঁৎসেঁতে, রুদ্ধ, মৎসর,
ছড়ায় সাম্রাজ্য তার, আর্তিময়, চেতনারহিত।

পথ চলি ; অন্ধকারে কবরের গন্ধ ওঠে রুখে,
পা ঠেকে খানায়, গর্তে, নর্দমার শীতল শামুকে,
অচিন্ত্য ব্যাঙের গলা রাষ্ট্র করে বিষাদসংগীত।

একটি মুখের প্রতিশ্রুতি

পাণ্ডুবরনী, ভালোবাসি বাঁকা ভুরু তোমার,
দীপ্ত, তরল, অমার যুগল ঝরনা ;
এত কালো চোখ, তবু সে যন্ত্রী যে-ভাবনার
তাতে নেই শবযাত্রার অবতারণা।

সেই চোখ, যার ছন্দ তোমার নিবিড়, ঘন,
কৃষ্ণ কেশের চঞ্চলতায় মেলায় তাল,
সে-কালো চোখের লাস্য আমায় বলছে : "শোনো—
যদি ভালোবাসো নম্যকলার ইন্দ্রজাল—

এসো না তাহ'লে, যে-আশা আমরা দিয়েছি জেলে—
এবং তোমার কল্পনারেও—করবে জয় !
নাভিমূল থেকে নিতম্বময় প্রমাণ পেলে—
দেখবে আমরা পণরক্ষায় অকুতোভয়।

মোহন, পৃথুল, যুগল স্তনের বৃন্তে
ব্রোঞ্জের দুটি নিটোল মুদ্রা পড়বে ধরা,
আর উদরের সীমায় পারবে চিনতে
মখমল-কালো, বোদ্ধের মতো স্বপ্নে ভরা,

কোমল রোমের ঐশ্বর্যের অন্ধকার,
এই কেশরের সত্য সোদরা, সধর্মিণী,
কোঁকড়া, লাজুক, চপল, গভীর—তুলনা যার
শুধু অমানিশা, তারাহীন নিশা, তমস্বিনী !"

সুন্দর জাহাজ

অলস মায়াবিনী, বলবো তোরে, শোন,
অঙ্গে শোভে তোর কত না আভরণ।
আঁকবো অপরূপ মাধুরী—
বালিকা-মহিলার মিলন-মোহানার চাতুরী।

যখন ফুলে ওঠে আঁচলে ঢেউ তুলে হাওয়ার অভিমান,
তখন মানি তোরে সুতনু তরণীর সাগর-অভিযান।
তেমনি চঞ্চল, উত্তাল,
শিথিল, মন্থর ছন্দে হেলে-দুলে ছড়িয়ে দিলি পাল।

দৃপ্ত গ্রীবা তোর, নধর স্কন্ধের আয়োজন
দেখায় মাথাটির কত যে অদ্ভুত বিকিরণ ;
সৌম্য বিজয়ের নির্যাস
ছড়িয়ে, ওরে শিশু-রাজ্ঞী ! তোর পথে হেলায় চ'লে যাস।

অলস মায়াবিনী, বলবো তোরে, শোন,
অঙ্গে শোভে তোর কত না আভরণ।
আঁকবো অপরূপ মাধুরী—
বালিকা-মহিলার মিলন-মোহানার চাতুরী।

এগিয়ে আসে তোর নিটোল স্তনভার রেশমে অবিরাম,
অনেক দ্বৈরথে বিজয়ী ওরা দুটি বর্ম অভিরাম—
যুগল ঢাল ধরে কত না
সুগোল, রেখায়িত আলোক-রশ্মির দ্যোতনা।

উগ্র ঢাল, তার তীক্ষ্ণ শরমুখ রঙিন, কোপনীয়,
রেখেছে সঞ্চিত যা-কিছু মায়াময়, মধুর, গোপনীয়—
আসব, সুরা, সৌগন্ধ্য—
বুদ্ধি বানচাল, হৃদয়ে প্রলাপের ছন্দ।

যখন ফুলে ওঠে আঁচলে ঢেউ তুলে হাওয়ার অভিমান,
তখন মানি তোরে সুতনু তরণীর সাগর-অভিযান।
তেমনি চঞ্চল, উত্তাল,
শিথিল, মন্থর ছন্দে হেলে-দুলে ছড়িয়ে দিলি পাল।

মহান জংঘার আঘাতে বসনের আলোড়ন
জাগায় যাতনায় আঁধার বাসনার আবেদন।
যেন রে ডাকিনীরা দু-জনে
গভীর খলে নাড়ে কালিমা-ঘন এক পাঁচনে।

প্রবল নায়কের বিরোধী খেলোয়াড় অকাতর,
ও-দুটি বাহু যেন কান্তিঝলকিত অজগর ;
প্রেমিক বাঁধা পড়ে, ক্ষমাহীন
অতি কঠিন তোর হৃদয়-কারাগারে, চিরদিন।

দৃপ্ত গ্রীবা তোর, নখর স্কন্ধের আয়োজন
দেখায় মাথাটির কত যে অদ্ভুত বিকিরণ ;
সৌম্য বিজয়ের নির্যাস
ছড়িয়ে, ওরে শিশু-রাজ্ঞী ! তোর পথে হেলায় চ'লে যাস।

তিনটি কবিতা

মৃণালকান্তি

প্রতীক্ষা

সে আসে নি,
—দুপুর গড়ায়।
শূন্য ঘর
নিঃসঙ্গ প্রহর—
বৃষ্টি-ঝরা ঝাপসা দিনের
ছায়া ঝরে,
কত কথা
ছায়ার অক্ষরে।

পান্থ

ক্লান্তিকর রুক্ষ দিন, রাত্রি কাটে ঘুমের বিকারে।
উদয়াস্ত চলি আমি দাবদগ্ধ দুস্তর সংসারে
রৌদ্র ঝড়ে ধূলি ধূসরিত পথে, আশাবদ্ধ মনে,
হে সুন্দর, অনির্বাণ, তোমার সুচির অন্বেষণে।
মৃত্যু জানি ছায়াসহচর, আর জরা শোক ভয়
সেও আছে ; নীরব কান্নায় ভেঙে পড়ি, এ হৃদয়
কী দুঃসহ যন্ত্রণার ক্ষয়কীট খায় কুরে কুরে।—
শান্তি চাই, নতুবা সমস্ত ব্যথা শবের চাদরে দাও মুড়ে॥

অন্ধ

কী যে শান্তি নীলিমায়, ঘাস, গাছ মাঠের প্রান্তরে
মেঘে মেঘে আঁকা। দূর দিগ্বলয়ে বর্ণধূলি ঝরে,
রোদে নীল প্রজাপতি ; ফুলগুলি গাছের শাখায়।
সন্ধ্যার অঙ্গনে স্বপ্নের ইশারা ফোটে একক তারায়,
নির্জন রাত্রির মূর্তি চুপি-চুপি লঘু পদপাতে
নিঃশব্দে দাঁড়ায় এসে ছায়াম্লান স্তব্ধ জানালাতে।
বিকীর্ণ অজস্র ছবি আলোয় সৃষ্টির আঙিনায়—
এর মূল্য কানাকড়ি। ঘোলা ক'রে সময়ের জল,
অনিদ্র কুটিল পথে মানুষের যাত্রা অবিরল;
অবশেষে নিশ্চিন্ত আশ্রয় নেয় মৃত্যুর গুহাতে
শতচ্ছিদ্র কীটদষ্ট সময়ের শূন্য ঝুলি হাতে॥

গিনিপিগ

রণেন্দ্রনাথ দেব

পুরোনো উদ্যানপ্রান্তে নির্জন নিমের ছায়া ধ'রে
শিশিরবিন্দুর মতো সূর্যলোক যেই নামে ঘাসে,
দিনের আহার্য নিতে ক্ষুধাতুর গিনিপিগ আসে
শব্দহীন পদক্ষেপে, সতর্ক দু'কান খাড়া ক'রে।
শাদা-বাদামিতে মেশা সুচিক্কণ দেহের ভিতরে
পরিতৃপ্ত জীবলীলা। দুপুরের নিঃসঙ্গ বাতাসে
গোলাপি পা দিয়ে তার ঘাড়, মুখ ঘ'ষে অনায়াসে
আরামে দু'চোখ বোজে পেয়ারার প্রশান্ত কোটরে।

তবু কেন মাঝে মাঝে উচ্চকিত মনে হয় তাকে ?
ঘাস খেতে ভুলে যায়, কচিপাতা খোঁজে নাকো আর।
কোন দূর দিগন্তরে কালো হাওয়া ওঠে আশঙ্কার,
যোজন-বিস্তৃত ভয়ে এপারের পথঘাট ঢাকে ?
আরক্তিম নেত্রে তার মৃত্যুর নিষাদ-মূর্তি আঁকে—
সে কি বিড়ালের থাবা কিংবা কোনো চিলের চিৎকার ?

২

এদিকে দিনের শেষে অতর্কিতে সীমান্তের বনে
শাখা হতে শাখান্তরে ছুটে চলে দাবানল-শিখা ;
পলাতক পশুদের চোখে মুখে ত্রস্ত বিভীষিকা,
মুহূর্তে অদৃশ্য হয় দিশাহারা উন্মত্ত ধাবনে।

এলোমেলো পাখি-ওড়া সীসা-মাখা আকাশের কোণে
জলন্ত বহ্নির বাহু এঁকে দেয় গাঢ় লাল টিকা—
কী আতঙ্কে মুখ ঢাকে নরনারী বালক-বালিকা,
তেজস্ক্রিয় মেঘ ঘোরে রক্তঝরা সন্ধ্যার গগনে।

পুরোনো উদ্যানপ্রান্তে গিনিপিগ ফেরে খাদ্য খুঁজে,
কখনো বা শুয়ে থাকে আমলকি গাছের ছায়ায়।
দেহ দগ্ধ, স্মৃতি তিক্ত—আমাদের মন শুধু চায়
তারি মতো ডুবে যেতে পৃথিবীর অক্লান্ত সবুজে।
কিন্তু সেও শ্রান্ত নাকি জীবনের সাথে যুঝে-যুঝে ?
মাঝে-মাঝে উচ্চকিত ঘাড় তুলে কেন সে তাকায় ?

রূপের পুতুল

জ্যোতির্ময় দত্ত

তার রূপের পাখি সুখের হ'লো না।

শুধু একলা জলা দুপুরে। বাদামি বনে
উলঙ্গ, নির্বান্ধব মেয়ের একাকী উদ্বন্ধনে
আত্মহত্যার মতো। শুধু রূপের বঞ্চনা।

কোনোকালে এরও ছিল সবুজ আগ্নেয় বসন্ত।
রাত্রে কখনো-কখনো সেই কালো ঘোড়া তাকেও জলন্ত
কেশরে বেঁধে অন্ধকারে গেছে নিয়ে ;
স্বপ্নের গুহায় বসন্তের নিষ্ঠুর শিকারী
তাকে করেছে হরণ। নির্ঘুম রাত্রে এই মেয়ে
জেগে-জেগে বাসনায় ক্ষণে-ক্ষণে হয়েছে ফেরারি।

হরিয়ালের যাযাবর ঝাঁকের সবুজ আশমানি নদীতে
ভাসিয়ে আনতো বিদেশী ভাষা। বিদেশী পুরুষ,
তাতার কাফতান গায়ে, মাথায় রঙিন উষ্ণীষ
পাখিদের চোখে চিঠি পাঠাতো। চকিতে
আবিষ্কার করতো সামনে তুর্কমেন সওয়ার! সুপারি ছায়ায়,
কিছু গল্প, গাঁয়ের মেয়ের, বসন্তের সার্বজনীন ভাষায়।

কিন্তু সে-বসন্ত অদ্বিতীয়। পরের বছর
তার বিয়ে হ'লো, বড়ো চাকুরে। তারপর
সকাল-বিকেলের ঝুল-কয়লা-কালি
ধুয়ে আবার সকাল-দুপুর। মুক্তোর মতো নিটোল-গঠন
দেহ এখনো সুঠাম আছে। কিন্তু নিতম্বে বালি
আর গর্ভ কৃপাহীন। সে সূর্য-বীজের বপন
তার স্বামী করেন নি। আগ্নেয় উদরে তার
যে-কোনো বন্ধ্যা মহিষের মতো শুধু শূন্যতার ভার।

সদ্য-বিবাহিত মালির মেয়েটিকে অথচ দেখ। সকৌতূহলে
সে মেয়েটিকে গোপনে প্রশ্ন করে। মেয়েটির
নতুন-পাওয়া রূপ শ্রাবণে গাছের বাকলে
নতুন শ্যাওলার মতো চকচকে ; সুখ যেন শিশির,
অবিরল ঝরবে তাকে একটু ঝাঁকালেই।
মেয়েটির দেহটি নিটোল, যেন পেটানো পিতল ;
পুরুষের গায়ে নাকি গ'লে গেল, গ'লে হ'লো জলের পুতুল ;
এখন সে নাকি তার আসছে-শিশুকে দেখে চোখ বুজলেই।

দুপুর ক্রমে সন্ধ্যা হয়। সে সোজা হ'য়ে ব'সে—
ডিঙিতে শিকারি জেলের মতো নিশ্চুপ, সজাগ। কোনো
অসম্ভব কল্পনা সে তার তীব্র বাসনার বশে
নীরবে এক হংসীর মতো তা দিচ্ছে।

শীতের রাত্রে যেমন ফোঁটায়-ফোঁটায়
খেজুরের গাছ স্ব-দেহের রসে পাত্র ভরায়
তার বাসনা আর বেদনা জ'মে-জ'মে এতকাল পরে
আজ উপচে পড়লো। বাসনার মাদক মউলের প্রভাবে
সে হয়ত তার ইচ্ছার তীব্রতা দিয়েই, উচিত স্বামীর অভাবে,
ওরসে সন্তান আনবে। অথবা
তার ইচ্ছে
কোনো সহজ পুরুষ, নিষাদের মত বন্য,
মালির মেয়েটির মতো জীবনের আহেলি,
যে বৃষ্টি আনবে। নিতম্বের বালি
ধুয়ে দেবে আকাঙ্ক্ষিত দুধে। এতকালের ফাঁকি
ঘুচবে তখন, নামবে সুখের পাখি।

ইতিহাস

শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়

সিঁদুরকৌটোয় মোড়া দীর্ঘ ইতিকথা
তোরঙ্গের এক কোণে মুখ গুঁজে আছে,
শত নাম, নামাবলী কত কথকতা
প্রসাধন দ্রব্য, দাগ আয়নার কাচে ;

বান্ধব পূর্বজ-বার্তা রটে মুখে-মুখে,
কৌলীন্য গর্বের বস্তু অমন সেকালে—
লক্ষ প্রেমে দিন কাটে কী জানি কী সুখে,
সিঁদুরকৌটোর ব্যথা বুঝি না একালে !

যৌবন

হুমায়ুন কবির

তোমারে ভুলিতে হবে অতীতের দীপ্ত ইতিহাস।
সহস্র বৎসর ভরি ভারতের একপ্রান্ত হতে
অন্য প্রান্তে বহিয়াছ যৌবনের দুর্নিবার স্রোতে
চূর্ণ করি জীর্ণ জরা। জীবনের নবীন আশ্বাস
রচিয়াছ ছন্দে গানে স্থপতির ভাস্বর পাষাণে।
মানো নাই কোনো বাধা, আচারের প্রাচীন নিষেধ,
ভেঙেছ উল্লাসভরে বর্ণ শ্রেণী জাতি ধর্ম ভেদ,
রক্তে মিশিয়াছে রক্ত, প্রতিধ্বনি প্রাণ হতে প্রাণে।

কী মোহে হয়েছ অন্ধ? মুক্তি কোথা বন্ধনের মাঝে?
লঙ্ঘি দেশ জাতিভেদ আজি বিশ্বমানব চলিছে
এক-রাষ্ট্র-লক্ষ্য পানে যৌবনের বেগে দুর্নিবার—
সেই অগ্রগতি ভুলি ফিরিয়া আসিবে আজি পিছে
সংকীর্ণ সীমার মাঝে অতীতেরে করি অস্বীকার?

পশ্চাতে ফিরিবে যারা লুপ্ত হবে অপমানে লাজে।

চতুর্দশপদী

বিষ্ণু দে

বহু দীর্ঘ পরিক্রমা, নীল কন্যাকুমারিকা থেকে
নদনদী মাঠক্ষেত পাহাড়পর্বত পার হ'য়ে
ডিঙিয়ে অগস্ত্যবিন্ধ্য, গঙ্গায় মুক্তির গাহনে
লঘিমা সর্বাঙ্গে মেখে ধূর্জটির জটা ব'য়ে শেষে
মন্দাকিনী নির্ঝরের শীকরবীজন ভূর্জবনে
এসেছি, এখানে হাওয়া স্বচ্ছ নীল অণিমা বিথারে,
প্রৌঢ়ের প্রশান্তি ফেলে থেকে থেকে ঈথারে নিশ্বাস ;
তন্দ্রবায়ু দিবাস্বপ্নে ভাসে দেখি স্থবির বৃদ্ধের
সম্পূর্ণ স্থিতির রাত্রি আসমুদ্র হিমাচলে স্থির :
কন্যাকুমারিকা থেকে অভিযাত্রী আমি ক্লান্তিহীন
এবারে পৌঁছব বুঝি কৈলাসের দিন পার হ'য়ে
সাংপোর উৎসের জলে সর্বগ্লানি রতির রোদনে
ধুয়ে দেব, শুভ্র হিমে আমৃত্যু রইব শুধু চেয়ে,
সৌন্দর্যে বিধুর শুদ্ধ, ত্রিনয়নে যেমন পার্বতী।

গান

অমিয় চক্রবর্তী

এক

ভালোবাসার বদলে আর কী বলো যায় দেয়া,
কেবল ভালোবাসা—
সব-হারানো সব-পারানো ভাষায় ভরা ভাষা
চোখের জলে ভাসা গো
স্বর্গ বেলায় স্বর্গ-নেয়া-দেয়া।

কখন দূরের ছায়া আনে সূর্যদিনের সোনা
গগন জুড়ে ভরে ব্যথার কোণা—
গাছের শব্দ মন্ত্র শোনায় গো,
অনেক দুখের আশা, বঁধু, অনেক সুখের আশা—
ভালোবাসার দিনে তখন কতই কাঁদা হাসা—
তাইতে যাওয়া-আসা গো,
চিরদিনের বাসা॥

কলকাতা
৩০ জুলাই, ১৯৫৫

দুই

কেউ বা আলো কেউ বা আগুন কেউ বা জল
তোদের নাম কী বল।
ভুবনডাঙার মানুষ আমি এলেম তোদের অনুগামী
ডাকনামেতে জানি ডাকার ছল।
ও সামন্ত কানু মধু, কাসেম তামিজ নিমাই যদু,
আসল নাম কী বল।
কেউ বা মুলো, কেউ বা ধুলো, কেউ বা ফল॥

যাব গাঁয়ের পার
হাটের বেলা শেষ হ'লে ধাই শাঙন নদীর ধার—
তোদের নাম কী বল ?
কেউ বা মাসি পিসি খুড়ো সঙ্গী স্যাঙাৎ মোড়ল বুড়ো,
ভুবনডাঙার মেয়েছেলের দল।
শর্ষে খেতে মৌমাছি ফুল, নামে নামে মন ভ্রমাকুল
আসল নাম কী বল॥

ওঅল্ট হুইটম্যান—একশো বছর পরে

'Do I contradict myself ?
Very well, then, I contradict msyelf :
(I am large—I contain multitudes.)

—'Song of Myself'

কোনো কবিকে যাচাই করবার পক্ষে একশো বছর সময় নিতান্ত কম বলব না। কিন্তু কবি হিসেবে ওঅল্ট হুইটম্যানের আসন এখন পর্যন্ত কেমন অনিশ্চিত থেকে গেছে, সকলের চাইতে ভিন্ন, স্বতন্ত্র। যেন এখনো আমরা তাঁর বিষয়ে ভালো করে মনস্থির করতে পারছি না। এবং এ-অবস্থাটা গত একশো বছর ধ'রেই চলছে। একদল আছেন, হুইটম্যান যাঁদের কাছে গণতন্ত্রের মহাকবি তো বটেই, তার চাইতেও আরো কিছু। হয়তো বড়ো কিছু! তাঁদের কাছে তিনি পরমপুরুষের অবতার, ভাবী যুগের স্বপ্ন সফল করার বীজ বুনেছেন মানুষের প্রাণে, আধুনিকতম বিপ্লবের প্রথম চারণ কবি তিনি। এঁদের মনের মধ্যে হুইটম্যানের যে দেবদুর্লভ শক্তিধর মূর্তি আঁকা তার সঙ্গে টলস্টয়ের সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। একটু হয়তো বেশি ফিটফাট, কিন্তু মাথা ভরা সেই এলোমেলো শুভ্র কেশ, টপ্‌হ্যাটেও যা চাপা

পড়েনি ; বিস্রস্ত শ্মশ্রুরাশি আগুনের শ্বেত শিখার মতো মুখটিকে ঘিরে আছে : বিশ্বের বেদনা ভরা গভীর দুই চোখে দৃঢ়তা আর প্রত্যয়। হুইটম্যান বলতে এই 'good gray poet'-এর কথাই মনে পড়ে তাঁদের, যিনি লিখেছেন :

I speak the pass-word primeval—I give the sign of democracy ;
By God ! I will accept nothing which all cannot have their counterpart of on the same terms.

এবং যাঁর কবিতা পড়ে এমার্সন বলেছিলেন : 'incomparable things, said incomparably well'। অন্যদিকে ছিলেন সমাজের প্রতিপত্তিশালী আর এক বৃহৎ গোষ্ঠী, হুইটম্যানকে যাঁরা কোনোদিন ক্ষমা করতে পারলেন না। সুনীতিকাতর সাধু ভিক্টরীয় ইংলণ্ড যখন টেনিসনীয় গুঞ্জনে মুখর, সমুদ্রের অন্য পারে, আজ থেকে একশো বছর আগেকার আধা-শহর ব্রুকলিনে ব'সে, পাঠকের অনভ্যস্ত ভাবে-ভাষায় এ-ধরনের ইংরেজি কাব্য রচনা করা নিশ্চয়ই স্পর্ধার কথা। এবং সে-স্পর্ধাকে ভদ্রভাষায় মোলায়েম ক'রে বলারও কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না সেই যুবকের রচনাতে। ১৮৫৫ সালে লেখকের নিজের খরচে ছাপা '*Leaves of Grass*'-এর সেই আদি সংস্করণ গ্রাহ্যই করলেন না কেউ-কেউ। চিরাচরিত সমিল-অমিল ছন্দের আয়াত্বিক শৃঙ্খলা নেই এ-কবিতায় ; বিষয়বস্তুর বাছবিচার নেই কোনো ; বিশ্বপৃথিবীর সব কিছুই নির্বিচার উৎসাহ নিয়ে কাব্যের কটাহে ঢালা হয়েছে। এ-জিনিষ সহ্য করা বাস্তবিকই কঠিন। তাছাড়া ভদ্র সজ্জনের মতো টেনিসন তাঁর কাব্যে মাতৃস্তন্যের উল্লেখও যখন সলজ্জভাবে এড়িয়ে চলছেন, অকাব্যিক স্থূলবস্তু জ্ঞানে মাছ জিনিশটার মতো নিরীহ একটি প্রাণীর স্পষ্ট প্রসঙ্গও যখন পোয়েট-লরিয়েট-এর রচনা থেকে নির্বাসিত, তখন হুইটম্যান কিনা মানুষের যৌন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সংগমাদির কথা পর্যন্ত অক্লেশে চালিয়ে দিলেন তাঁর কবিতায়! শুধু চালিয়ে দিলেন না, রীতিমতো ভক্তিভরে তার স্তব রচনা করলেন। এই সব গোপনীয় 'লজ্জা'র কথা এত স্পষ্ট ক'রে কবিতায় যে বলা যায়, বলা উচিত, একশো বছর আগে তা কল্পনায় ছিল না কারো। ভিক্টরিয়ানদের তুলনায় রানী এলিজাবেথের প্রজাবৃন্দের মনে

লজ্জাশরম যথেষ্ট পরিমাণে কম ছিল বটে, কিন্তু দেহের বন্দনায় এতদূর রহস্যময় উদ্দাম উচ্ছ্বাস এলিজাবিথান কাব্যেও নেই।

If anything is sacred, the human body is sacred,
And the glory and sweat of a man, is token of manhood untainted ;
And in man or woman, a clean, strong, firm-fibred body is beautiful
as the most beautiful face.

কিংবা

I have said that the soul is not more than the body,
And I have said that the body is not more than the soul ;
And nothing, not God, is greater to one than one's self is.

এ-ধরনের নাস্তিকজনোচিত কথা উচ্চারণ করার জন্য জাত-খোয়ানো বলিষ্ঠপৌরুষ কোনো কবির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেকালের বিবেকবান সজ্জন পাঠকমণ্ডলীর অতটা সহ্য হয়নি। তারপর ক্রমে যখন শুধু নারীর প্রতি নয়, পুরুষের প্রতি পুরুষের ভালোবাসার কথাও বিনা কুণ্ঠায়, অসংকোচে কবিতা ক'রে লিখতে পারলেন হুইটম্যান তখন, তাঁর ভক্তবৃন্দ যা-ই বলুন, সমাজের গণ্যমান্যদের পক্ষে মুখ বুজে সহ্য করা কঠিন হোলো। 'অশ্লীল' লেখার দায়ে ডিপার্টমেণ্ট অব ইণ্টিরিয়র থেকে চাকরি গেল হুইটম্যানের। অথচ আশ্চর্য এই—তাঁর কাব্য বিষয়ে এত রকমের মতভেদ থাকা সত্ত্বেও প্রতি নতুন সংস্করণে *Leaves of Grass*-এর কলেবরের মতোই হুইটম্যানের খ্যাতি প্রতিপত্তি দিনে দিনে বেড়েই গেছে। এমন কি যাঁরা তাঁর কাব্যগ্রন্থের নামটিই শুধু শুনেছেন, তাঁদের কাছেও এ-কথা অজানা নেই যে দেশকালের সীমা ছাড়িয়ে 'অমর'দের সঙ্গে আসন নিয়েছেন এই কবি।

ব্যক্তিগত জীবনে নিতান্ত নিরীহ নির্বিবাদী ভদ্রলোক ছিলেন হুইটম্যান। বিক্রম, তেজ, পাগলামি,—কোনো কিছুরই পরিচয় দেননি তাঁর কার্যকলাপে। র‍্যাঁবোর মতো বেআইনি মাদক চালান দেবার চেষ্টা করেননি কোনোদিন; ভ্যান গোর মতো স্বীয় কর্ণচ্ছেদ করেননি কোনো উন্মাদ মুহূর্তে। খবর-কাগজের আপিশে টাইপ সাজিয়েছেন, প্রুফ দেখেছেন, সম্পাদনার কাজও

করেছিলেন কিছুদিন। ঐ পর্যন্ত। তারপর সামান্য কিছুকাল নিউ অর্লীন্সে কাটিয়ে আসার পর কী ক'রে কী আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটলো তাঁর জীবনে, তা জানা যায় না। সলজ্জ কুণ্ঠিত অস্ফুট যাঁর গলার আবৃত্তি ঘরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ঠিকমতো পৌঁছত না, বজ্রের মতো আত্মপ্রত্যয়ের প্রবল নির্ঘোষ হঠাৎ তাঁর কবিতায় যেন আকাশ ভেঙে নেমে এলো :

Walt Whitman am I, a Kosmos, of mighty Manhattan the son,
Turbulent, fleshy and sensual, eating, drinking and breeding ;
No sentimentalist—no stander above men and women, or
apart from them ;
No more modest than immodest. ...

Through me many long dumb voices ;
Voices of the interminable generations of slaves
Voices of prostitutes, and of deform'd persons ;
Voices of the diseas'd and despairing, and of thieves and dwarfs...
I believe a leaf of grass is no less than the journey-work
of the stars. .....

স্বীকার করতেই হবে—আশ্চর্য উন্মাদনায় ভরা এ এক সম্পূর্ণ নবীন কবির কণ্ঠস্বর, ইংরেজি কাব্যের ইতিহাসে এমনটি আর শোনা যায়নি। ক্লান্তিকর দীর্ঘতা এবং কাব্যের নামে নানা বিচিত্র জিনিশের একঘেয়ে তালিকা করার দিকে দুর্বার প্রবণতা সত্ত্বেও এ-কবিতার সম্মোহন এড়ানো কঠিন। অনুচ্চার্য যৌন প্রসঙ্গের অস্পৃশ্যতা কোথায় ভেসে চ'লে গেল। দূর হয়ে গেল আত্মার মুক্তির জন্য খৃষ্টীয় উদ্বেগ আর ব্যাকুলতা। ব্যক্তির যে-কৈবল্যকে মানুষের মহামূল্য অধিকার ব'লে আজ আমরা স্বীকার ক'রে নিয়েছি, তার সপক্ষে প্রথম প্রবল কণ্ঠ শোনা গেল এই কবিতায়। কিন্তু এই বিস্ময়কর আত্মকীর্তনের নায়ক, কে এই 'I, Walt Whitman' ? প্রেমে ব্যর্থ, জীবিকায় ব্যর্থ, নামগোত্রহীন কোয়েকার পরিবারের ছেলে, ব্রুকলিন নিবাসী রুগ্ন সাংবাদিক Walter Whitman-এর মধ্যে 'turbulent, fleshy and sensual, eating, drinking and breeding' নায়কটিকে আবিষ্কার করতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র।

'লীভস অব গ্রাস' প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে তাকে মহৎ কাব্য ব'লে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন যিনি, সেই এমার্সনও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেননি যে 'Walt Whitman' সত্যি-সত্যি কোনো জীবিত ব্যক্তির নাম এবং চিঠি লিখলে ব্রুকলিনের ডাকঘর তা যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দিতে পারবে। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত জীবনের লেখকের সঙ্গে শিল্পীর ধ্যানমূর্তিকে তিনি একাকার করার কথা ভাবতে পারেননি। অথচ, তাঁর অন্ধ স্তাবকদের মতোই, সেই ভুলটি ক'রে বসলেন লেখক স্বয়ং—Walter Whitman হলেন Walt Whitman, এবং নিজেকেই নিজের কাব্যের নায়ক ব'লে পরিচিত করার প্রাণপণ চেষ্টায় সমস্ত জীবন ব্যয় করলেন তিনি।

কাব্যের আলোচনায় এ-প্রসঙ্গ হয়তো অবান্তর। কিন্তু শিল্পী আর ব্যক্তির অদ্বৈতে বিশ্বাসী যাঁরা, তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের কল্পলোকবাসী কবির বহুবিধ কীর্তিকলাপ অবগত হলে বিশেষ বিচলিত বোধ করবেন। যৌবনে নারীসংসর্গে ওর্ডস্‌ওয়র্থ-এরও 'পতন' হয়েছিল, কিন্তু সে-সব কথা সযত্নে গোপন করার চেষ্টাই করেছেন সেই প্রকৃতির প্রিয় পুরোহিত। আর নিজের আকাট পৌরুষের সন্থ-সন্থ প্রমাণ উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে হুইটম্যান যে-পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তা আরো মজার। তিনি এক অবৈধ প্রণয় এবং তজ্জাত জারজ সন্তানদের কথা সদর্পে নিজের নামে প্রচার ক'রে বেড়াতেন, যদিও ব্যাপারটা, যদ্দূর জানা যায়, নিতান্ত স্বকপোলকল্পিত। 'লীভস অব গ্রাস'-এর মতো কাব্যগ্রন্থের লেখককে বিখ্যাত হবার জন্য কৌশল করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বইয়ের প্রথম উচ্ছ্বসিত রিভিউটি কবি স্বয়ং লিখে পত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন, যাতে কবির বিষয়ে বলা হয়েছিল :

If health were not his distinguishing attribute, this poet would be the very harlot of persons. Right and left he flings his arms, drawing man and woman with undeniable love to his close embrace, loving the clasp of their hands, the touch of their neck and breast, and the sound of their voices.... He must recreate poetry with the elements always at hand.

অবিশ্বাস্য লাগে ভাবতে যে নিজের বিষয়ে এ-রকমের নির্লজ্জ নাটকীয় বিবরণ কেউ নিজে লিখে ছাপাতে পারেন। শুধু কি তা-ই! ১৮৬৭ সালে জন্ বারো নামে এক ভদ্রলোক *Notes on Walt Whitman, Poet and Person* নামে তাঁর যে প্রশস্তি রচনা করেছিলেন তার প্রায় অর্ধেকটাই হুইটম্যান নিজে লিখে দিয়েছিলেন।

তাঁর দুর্বল মুহূর্তে কবি নিজে যাই ভাবুন, প্রকৃতপক্ষে এ-কাব্যের নায়ক ওঅল্ট হুইটম্যান হচ্ছেন মাটির তিলক-পরা নতুন যুগের সামান্য মানুষেরই কল্পিত মূর্তি, অতীতের যাবতীয় তুচ্ছতাকে উড়িয়ে দিয়ে, ডেমোক্রাসির খোলা রাস্তায় অন্তহীন সম্ভাবনার দিকে যে-মানুষ যাত্রা করেছে। অন্তত হুইটম্যান তার স্বপ্নই দেখেছিলেন। ধুলোয় ভরা খোলা রাস্তার এই আশ্চর্য পাঁচালির মধ্যে অতিমানবের মহিমা কীর্তন করেননি হুইটম্যান :

The New World needs the poems of realities and science and of the democratic average and basic equality....Without yielding an inch the working man and working woman were to be in my pages from first to last. The ranges of heroism and loftiness with which Greek and feudal poets endow'd their god-like on lordly-born characters—indeed prouder and better based and with fuller ranges than those—I was to endow the democratic averages....

তিনি বিদগ্ধ সমাজে প্রিয় হতে পারলেন না, এবং তাঁর কাব্যের বিষয়ে আমরা এখনো মনস্থির করতে পারি না, তার কারণ এ-নয় যে তাঁর কবিতায় পুরুষ-প্রেমের কথা বড় বেশি স্পষ্ট ভাষায় উপস্থিত, (সচিত্র সুলভ বঙ্গানুবাদের সাক্ষ্য সত্ত্বেও কে না জানে—ওমর খৈয়ামের 'সাকি' কোনো নবীনা যুবতী নয়, নবীন কিশোর মাত্র!), কিংবা যেহেতু তাঁর কবিতা 'অশ্লীল'। হুইটম্যানকে আমাদের ক্লান্তিকর লাগে—যেহেতু তাঁর কবিতা অনাবশ্যক রকমের দীর্ঘ, আর অসহ্য পুনরাবৃত্তিতে ভরা। অতীতের কারাগার থেকে মানুষের মুক্তির যে-কল্পিত আনন্দে আত্মহারা না হলে এ কবিতা লেখা সম্ভব হতো না, সেই আনন্দের আতিশয্যেই তিনি বহুতর নতুন আবর্জনাকে তাঁর

কবিতায় স্থান দিয়েছিলেন—বিষয়টা সেখানে আনকোরা কাঁচা বিষয় হয়েই টিঁকে রয়েছে, কাব্যের আলো প'ড়ে ভাষার রূপান্তর ঘটতে পারেনি।

আঠারো বছর আগে কলকাতায় হুইটম্যান-স্মৃতিসভার উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'প্রকাণ্ড একটা খনি, ওর মধ্যে নানান কিছু নির্বিচারে মিশোল আছে, এ-রকম সর্বগ্রাসী বিমিশ্রণে প্রচুর শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন—আদিম-কালের বসুন্ধরার সেটা ছিল—তার কারণ তার মধ্যে আগুন ছিল প্রচণ্ড—এই আগুনে নানা মূল্যের জিনিষ গ'লে মিশে যায়। হুইটম্যানের চিত্তে সেই আগুন যা-তা কাণ্ড ক'রে বসেছে। জাগতিক সৃষ্টিতে যে রকম নির্বাচন নেই, সংঘটন আছে, এ সেই রকম। ছন্দোবন্ধ সব লণ্ডভণ্ড—মাঝে মাঝে এক একটা সুসংলগ্ন রূপ ফুটে উঠে আবার যায় মিলিয়ে। যেখানে কোনো যাচাই নেই, সেখানে সকলের সব স্থানই স্বস্থান। এক দৌড়ে সাহিত্যকে লঙ্ঘন ক'রে গিয়েছে এই জন্যে সাহিত্যে এর জুড়ি নেই—মুখরতা অপরিমেয়—তার মধ্যে সাহিত্য অসাহিত্য দুই সঞ্চরণ করছে আদিম যুগের মহাকায় জন্তুদের মতো। এই অরণ্যে ভ্রমণ করতে হলে মরিয়া হওয়া দরকার।" —নিষ্ঠুর মনে হলেও একশো বছর পরে কবি হিশেবে হুইটম্যানকে এর চাইতে বড়ো ব'লে স্বীকার করা সম্ভব নয়। তবে কথা হচ্ছে এই যে তা নিয়েই যে-কোনো কবি নিশ্চিন্তে 'অমর' হতে পারেন।

হুইটম্যানের ধারাটি যেন ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গেছে আধুনিক কাব্যে ; কার্ল স্যাণ্ডবার্গ ছাড়া তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন এবং মহা-পৃথিবীতে তাঁর বিশ্বস্ত ভক্তের সংখ্যা বিস্ময়কর রকমের কম। 'লীভস অব গ্রাস'-এর একশো বছর পূর্ণ হল, সেই উপলক্ষ্যে কিছু-কিছু আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে বটে। কিন্তু ইতিপূর্বে তাঁর বিষয়ে সশ্রদ্ধ আলোচনা আছে, আধুনিকদের মধ্যে, একমাত্র লরেন্সের প্রবন্ধে ; যেখানে তাঁকে "first white aboriginal" ব'লে অভিনন্দন জানিয়েছেন লরেন্স, কেননা, আর যাই হোক, দেহচ্যুত আত্মার কল্যাণচিন্তায় বিচলিত ছিলেন না হুইটম্যান। কিন্তু লরেন্সও আক্ষেপ করেছেন যে শেষ পর্যন্ত জীবনসর্বস্বতার এই নব নীতিতে বিশ্বস্ত থাকতে পারেননি হুইটম্যান। তাঁর কাব্যেও ডেমোক্রাটিক 'সহানুভূতি'

অবশেষে দয়া, করুণা আর প্রেমেই পর্যবসিত হয়েছে—যে-পথের শেষে ক্যালভরিতে হয়তো পৌঁছনো সম্ভব, তার পরে রাস্তা নেই।

আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত ব'লেই এই সূত্রে এজরা পাউণ্ডের কবিতাটিও মনে পড়বে, হুইটম্যানের সঙ্গে প্রকাশ্যে যিনি আধুনিকদের আত্মীয়তার কথা স্বীকার ক'রে লিখেছেন :

> I make a pact with you, Walt Whitman—...
> It was you that broke the new wood,
> Now it is a time for carving.
> We have one sap and one root—
> Let there be commerce between us.

আধুনিকদের সঙ্গে এইখানে হুইটম্যানের যোগ যে বোদলেয়ারের মতো তিনিও ছিলেন নাগরিক কবি—অন্তত অংশত তা-ই—শতবর্ষ পূর্বেকার ব্রুকলিন, মানহাটানকে যতদূর নগর বলা যায়, তার। ইংরেজি কবিতার ভাষাকে তিনি ছন্দের নূপুর-পরা নৃত্য থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এবং জন্ম-মৃত্যু, প্রেম লালসা জৈবতা আর দৈবতা সমেত পুরো মানুষটিকে স্পর্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে তাঁর 'বিবেকে' বাধেনি।

'লীভস অব গ্রাস' যখন প্রকাশ হয়, বাংলা সাহিত্যে তখন মাইকেলের যুগ চলছে। ইংরেজি এবং ইওরোপীয় সাহিত্যের প্রেরণা নিয়ে মাইকেলও পয়ার ভেঙে অমিত্রাক্ষরের জন্ম দিয়েছিলেন। কিন্তু হুইটম্যান আর মাইকেল,—দুয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। পরিচয় সম্ভব ছিল না, অর্থাৎ আদান-প্রদান, যাকে পাউণ্ড বলেছেন 'commerce'। পরে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে হুইটম্যানের কবিতার ক্লাশ নিয়েছেন। কিন্তু দুই কবির মানসিক চরিত্র এতই ভিন্ন যে রবীন্দ্র-রচনাবলীতে ব্রুকলিনের কবির কোনো সুদূর প্রতিধ্বনিও খুঁজতে যাওয়া বৃথা। অবশ্য 'লীভস অব গ্রাস' সবটাই যে প্রাণোন্মাদ মুখরতার কাব্য তা নয়—'I Sit And Look Out'-এর মতো বিষণ্ণ গম্ভীর আটোসাঁটো কবিতাও আছে। রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন' ('ভগবান, তুমি যুগে যুগে') —কবিতার সঙ্গে, বিশেষ ক'রে, এ-কবিতাটির সাদৃশ্য থাকলেও

থাকতে পারে বা। সেটা কোনো বলবার মতো কথা নয়। আসলে হুইটম্যানকে আবিষ্কারের উৎসাহ নিয়ে বাংলা কবিতায় প্রথম প্রবেশ করলেন 'কল্লোল'-যুগের কবিরা, বিশেষ ক'রে প্রেমেন্দ্র মিত্র। কিন্তু ইওরোপীয় ট্র্যাডিশান ভাণ্ডার যে-বলিষ্ঠ প্রেরণা থেকে 'Song of Myself'-এর মতো কবিতার উত্থান—বাংলাদেশের পরিবেশে কোথায় সেই প্রেরণা? গ্রীক থেকে শুরু ক'রে তাবৎ ইওরোপের সমস্ত কবিরা দাঁড়িয়ে আছেন হুইটম্যানের পিছনে—যাঁদের অস্বীকার করবার মতো স্মরণীয় স্পর্ধা দেখাতে পেরেছিলেন তিনি। 'কল্লোল'-যুগে বিদ্রোহী নবীন বাঙালি কবির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন একা রবীন্দ্রনাথ। হুইটম্যান যেখানে সমগ্র জীবনের বন্দনাগানে মুখর, সেখানে বাংলাদেশের কবি মৃদুকণ্ঠে লিখছেন :

> আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের
> বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই,
> সময় যে হায় নাই।

'ভাই' 'হায়' আর অনুপ্রাস ভরা ছন্দ মিল অবশ্য এই ঘোষণার চাইতে ভিন্ন রকমের ইঙ্গিতই করে। আর যা-ই হোক, হুইটম্যানকে সর্বহারার কবি ব'লে গণ্য করা, তাঁকে আংশিক, কাজেই ভুল, বোঝা। বাংলা কবিতায় হুইটম্যানের সুর বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের সচেতন পরিশ্রম সত্ত্বেও তাই মেকি প্রতিধ্বনি হ'য়েই শেষ হ'য়ে গেল।

আধুনিক বাংলা কবিতার প্রবণতা অন্য দিকে। তার মধ্যে 'লীভস অব গ্রাস'-এর সরল প্রাণোন্মাদনার স্থান নেই। কিন্তু এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে হুইটম্যান মহৎ কবিদের অন্যতম। এবং ভূরিপরিমাণ বর্জনীয় অংশ উপেক্ষা করলেও যা থাকে তাই নিয়েই তাঁর আশ্চর্য কাব্যগ্রন্থ মহৎ কবিতার স্বাদ এনে দেয়।

নরেশ গুহ

ওআল্ট হুইটম্যান
('লীভস অব গ্রাস'-এর প্রথম প্রকাশ : ১৮৫৫)

এমিল ভেরআরন (১৮৫৫-১৯১৬)
Constant Montald অঙ্কিত প্রতিকৃতি অনুসরণে

বর্ষ ২০, সংখ্যা ১

ভেরআরন-প্রসঙ্গে

[এমিল ভেরআরন বিষয়ে তাঁর সমসাময়িক দু-জন লেখকের মন্তব্য এখানে অনুবাদে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি : একজন স্তেফান ৎসোয়াইখ, তাঁর আদিভক্ত ও জর্মন অনুবাদক, আর-একজন রাইনার মারিয়া রিলকে। এতে ভেরআরন-এর কাব্য ও ব্যক্তিস্বরূপের যে-উজ্জ্বল ছবি পাওয়া যাবে, তাতে তাঁর রচনার সঙ্গে অপরিচিত পাঠকও তাঁর ভক্ত হ'য়ে পড়বেন। এটা লক্ষণীয় যে দু'জন লেখকই জর্মন : এই কবির প্রথম সমাদর ঘটে—ফ্রান্সে নয়, জর্মনিতে, এবং তাঁর কোনো-কোনো রচনা প্রথম প্রকাশিত হয় জর্মনিতে এবং রাশিয়ায়। স্পষ্টত, জর্মন মানসের সঙ্গে আত্মীয়তা ছিলো তাঁর, অথচ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জর্মনির নিন্দায় তাঁর লেখনী মুখর হ'য়ে উঠেছিলো। ইএটস ঠিকই বলেছিলেন—যুদ্ধের সময়ে মুখ বন্ধ রাখাই কবির কাজ।—সম্পাদক]

১. স্তেফান ৎসোয়াইখ-এর আত্মজীবনী থেকে

আমার ভবিষ্যতের পথ আমার মনের সামনে পরিষ্কার ছিলো। অনেক দেখবো, অনেক শিখবো—তারপর আরম্ভ! অকালে আত্মপ্রকাশের তাগিদে পা বাড়াবো না—প্রথমে শিখে নেবো এই জগতের ও জীবনের মূলসূত্র। বার্লিনের তীব্র লবণ আমার তৃষ্ণা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলো ; মনে-মনে ভাবছিলাম এই গ্রীষ্মে কোন দেশে বেড়াতে যাওয়া যায়। বেছে নিলাম বেলজিয়ম। কেননা সেখানে, সেই শতকান্তিক সময়ে, শিল্পকলায় এমন একটি প্রেরণা জেগে উঠেছিলো, যার তুলনায়, এমনকি, ফ্রান্সকেও ঈষৎ ম্লান মনে হ'তো কখনো-কখনো। চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে, কাব্যে, ইওরোপের যৌবনের তেজ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিলো বেলজিয়মে। তার মধ্যে যিনি আমাকে গভীরতম মুগ্ধ করেছিলেন, যাঁর রচনায় আমি গীতিকাব্যের সম্পূর্ণ একটি নতুন পথ দেখতে পেয়েছিলাম, তিনি—এমিল ভেরআরন। কিন্তু আমার এই আবিষ্কার ছিলো ব্যক্তিগত, প্রায় গোপন, কেননা তখন পর্যন্ত জর্মনিতে কেউ তাঁকে জানে না, আর সাহিত্যের কর্তৃপক্ষীয়রা তাঁকে গুলিয়ে ফেলছেন ভেরলেনের সঙ্গে, ঠিক যেমন রলাঁকেও অনেকে রস্তাঁ ব'লে ভুল করছেন। আর নিঃসঙ্গভাবে ভালোবাসা মানেই দ্বিগুণ ক'রে ভালোবাসা।

কিন্তু এখানে একটু থামলে বোধহয় ভালো হয়। এই বর্তমান যুগে, যখন জীবনের লয় অত্যন্ত দ্রুত, অভিজ্ঞতা অপরিমাণ, এই যুগের বিস্মৃতিপ্রবণ মানুষদের মধ্যে ক-জনের কাছে ভেরআরনের নামের কোনো অর্থ হয়, জানি না। তিনি চেয়েছিলেন ইওরোপকে ঠিক তা-ই দিতে হয়, যা মার্কিন-দেশকে দান করেছিলেন ওঅল্ট হুইটম্যান—আস্থার ঘোষণা, বর্তমান আর ভবিষ্যতের উপর বিশ্বাস : সকল ফরাশি ভাষার কবির মধ্যে তিনিই প্রথম : এমিল ভেরআরন। আধুনিক জগৎকে ভালোবেসেছিলেন তিনি, ভালোবেসে তাকে জয় করতে চেয়েছিলেন কবিতার জন্য। অন্যদের কাছে যন্ত্র ছিলো অশুভ, নগর কুৎসিত, বর্তমান কাল কবিত্বহীন ; কিন্তু প্রত্যেকটি নতুন উদ্ভাবনে, যান্ত্রিক কৃতিত্বে তাঁর ছিলো অগাধ উৎসাহ, আর তাঁর সেই আনন্দ লক্ষ্য ক'রে তিনিই আবার আনন্দিত হ'য়ে থাকতেন। এইভাবেই কাজ ক'রে যেতো তাঁর চেতন মন, আরো তীব্র ক'রে তুলতো আবেগ। আর এমনি ক'রেই তাঁর প্রাথমিক স্বল্পপরিমাণ কবিতাগুচ্ছ বেড়ে উঠেছিলো পরবর্তী মহান বন্দনার প্রস্রবণে। 'Admirez-vous les uns les autres' ('পরস্পরের গুণগ্রাহী হও') : এই ছিলো ইওরোপের মানবের উদ্দেশে তাঁর বাণী। আমাদের যৌবনকালের সমস্ত আশাকে তিনিই প্রথম কাব্যের মধ্যে ব্যক্ত করেছিলেন—যে-আশা এই নিদারুণ অধঃপতনের দিনে কিছুতেই বোঝা যায় না আর। ইওরোপের আর মনুষ্যত্বের যে-স্বপ্ন তখন আমরা দেখেছিলাম, সেই স্বপ্ন বহুকাল ধ'রে বিধৃত থাকবে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাবলীতে। আমার ব্রাসেলসে যাওয়ার আসল উদ্দেশ্য ছিলো ভেরআরনের সঙ্গে দেখা করা।

[ব্রাসেলসে এসে শুনলেম, ভেরআরন সেখানে নেই, এবং কদাচ তাঁর পল্লীকুটির ছেড়ে শহরে আসেন। কিন্তু ভাস্কর বন্ধু ভ্যান দের স্তাপেন-এর বাড়িতে লাঞ্চের নিমন্ত্রণে এসে অপ্রত্যাশিতভাবে কবির সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো।]

দুপুর হ'লো, আমরা খাবার ঘরে এসে বসলুম—সেখানে রঙিন শার্সির ভিতর দিয়ে রাস্তাটা চোখে পড়ে। হঠাৎ জানলার সামনে একটা ছায়া যেন থামলো। আঙুলের টোকা পড়লো রঙিন কাচে, সঙ্গে-সঙ্গে ঘণ্টা বেজে

উঠলো জোরে। "ঐ যে!" ব'লে শ্রীমতী ভ্যান স্তাপেন উঠলেন। আমি ভাবছিলুম ব্যাপারটা কী—কিন্তু তক্ষুনি দরজা খুললো ; জোরালো, গম্ভীর পা ফেলে ভিতরে এলেন—ভেরআরন। ফোটোগ্রাফ থেকে তাঁর মুখ আমার চেনা ছিলো : দেখামাত্র চিনতে পেরেছিলুম। এই বাড়িতে প্রায়ই আসেন তিনি, আজও প্রত্যাশিত ছিলেন ; কিন্তু আমাকে অবাক ক'রে দেবার জন্য স্তাপেন-দম্পতী আগে আমাকে কিছুই বলেননি। এবার তিনি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন ; তক্ষুনি গৃহকর্তার চাতুরীটুকু বুঝে ফেলে হাসিমুখে তাকালেন আমার দিকে। এই প্রথম আমি দেখলাম তাঁর স্বচ্ছ, কোমল দৃষ্টি, প্রথম অনুভব করলাম তাঁর প্রবল হাতের আঁকড়ে-ধরা ঘনিষ্ঠতা। উৎসাহে আর যাত্রার বেগে ভরপুর হ'য়ে এসেছেন—সর্বদাই তা-ই আসেন তিনি। খাবারে হাত দিতে-দিতেই কথা বলতে আরম্ভ করলেন। গিয়েছিলেন বন্ধুদের কাছে, তারপর এক চিত্রশালায়—সেই সংস্পর্শে জলজল করছেন এখনো। এ-ই তাঁর চরিত্র, এমনি ক'রেই আসেন তিনি সব সময়, উদ্বুদ্ধ, উজ্জ্বল, আনন্দিত—অনেক সময় উপলক্ষ্যটা তুচ্ছ, কিন্তু উৎসাহ তাঁর জীবনে একটি পবিত্র অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, যেন কোনো আগুনের শিখা অবিরল লাফিয়ে উঠছে তাঁর ঠোঁট থেকে। আর মুখের কথাগুলোকে অর্থময় ভঙ্গি দিয়ে চিহ্নিত করার শক্তিও তাঁর অসামান্য ; প্রথম কথাটি বলার সঙ্গে-সঙ্গেই শ্রোতাদের যেন বন্দী ক'রে নিলেন। তার কারণ মানুষটা একেবারেই উন্মুক্ত, নতুনকে নেবার জন্য উৎসুক—কিছুই তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না, সব-কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকেন। যেন নিজের সমগ্র সত্তাকে নিজেরই ভিতর থেকে বের ক'রে এনে তিনি ছুঁড়ে দিলেন অন্যদের দিকে : যেমন এই প্রথম দিনে, তেমনি পরেও আরো অসংখ্য বার তাঁর এই ঝড়ের মতো লুঠ-ক'রে-নেয়া ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মুগ্ধ হয়েছি আমি। তখন পর্যন্ত আমার বিষয়ে কিছুই জানেন না তিনি, শুধু তাঁর কাব্যের প্রতি আমার আসক্তির কথা জেনে আমাকে তাঁর ঘনিষ্ঠ ক'রে নিলেন।

লাঞ্চের পর আরো একটি বিস্ময়ের অবতারণা হ'লো। ভ্যান দের

স্তাপেনের বহুদিনের একটি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'তে চলেছে : কবির একটি আবক্ষ মূর্তি গড়ছেন তিনি, তার শেষ সিটিং আজই। আর এই সময়ে আমার উপস্থিতিও নাকি ভাগ্যের দয়া ব'লেই গণ্য ; কেননা ভেরআরন মানুষটি এমন ঊর্মিল যে তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য অন্য একজনের প্রয়োজন হয়, যাতে কথাচ্ছলে জীবন্ত হ'য়ে ওঠে মুখশ্রী। অতএব আমি দু-ঘণ্টা ধ'রে গভীর চোখে তাকিয়ে থাকলাম সেই মুখের দিকে, সেই উন্নত অবিস্মরণীয় ললাটে—যেখানে ইতিমধ্যেই দুঃসময়ের রেখা পড়েছে—আর তার উপরে মরচে-রঙের কেশগুচ্ছের দিকে। মুখটির গড়ন মজবুত, হাওয়ায় মাজা ব্রাউন রঙের চামড়া আঁট হয়ে বসেছে ; থুৎনি এগিয়ে এসেছে শিলাখণ্ডের মতো, পাৎলা ঠোঁটে ঝুলে আছে বলীয়ান ভেরসিনতরিস গুম্ফরাশি। তাঁর যত চঞ্চলতা তাঁর হাত দুটিতে—ক্ষীণ, শ্রবল, সুকুমার, সুদৃঢ় তাঁর হাত, সেখানে বিরল মেদমাংসের তলায় দপদপ ক'রে রক্তের তাপ জলছে। চাষিদের মতো চওড়া কাঁধ—তাঁর তেজস্বী ইচ্ছাশক্তির যোগ্য বাহন যেন, তুলনায় ছোটো অথচ জোরালো হাড়ে গড়া মাথাটিকে বড্ড ছোটো মনে হয় ; উঠে না-দাঁড়ালে বোঝা যায় না কত তাঁর শক্তি। আজও সেই মূর্তিটি দেখলে বুঝতে পারি এটা একেবারেই খাঁটি, কবির চরিত্র সম্পূর্ণরূপে ধরা পড়েছে এতে : দেখতে পাই এক অমর ক্ষমতার স্তম্ভ, কবিপ্রতিভার চাক্ষুষ নিদর্শন।

সেই তিন ঘণ্টায় তাঁকে আমি ভালোবাসতে শিখেছিলুম, সেই ভালোবাসার সারা জীবনেও ক্ষয় হ'লো না। তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিলো আশ্চর্য, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও তাকে আত্ম-তৃপ্তি ব'লে ভুল হ'তো না। অর্থ বিষয়ে স্বাধীন হ'য়ে ছিলেন ; লেখার চাইতে পল্লীজীবনে তাঁর আসক্তি ছিলো বেশি। কৃতিত্ব বিষয়েও স্বাধীন হ'য়ে ছিলেন ; আপোশ ক'রে, খাতির জমিয়ে, কিংবা সামাজিকতার সাহায্যে উন্নতির চেষ্টা করতেন না : বন্ধুদের অবিচল অনুরাগই যথেষ্ট ছিলো তাঁর। তাঁর মতো চরিত্রের যেটা সবচেয়ে ভয়ের প্রলোভন—সেই খ্যাতি, যা জীবনমধ্যাহ্নে তাঁর কাছে এসেছিলো, তারও ঊর্ধ্বে তিনি উঠতে পেরেছিলেন। সব অর্থেই মানুষটা তিনি

খোলা : কোনো অবদমনে ভারাক্রান্ত নন, কোনো অহমিকায় আত্মবিস্মৃত নন—মুক্ত, আনন্দময় পুরুষ, যে-কোনো মুগ্ধতার দ্বারা সহজে সংক্রমিত : তাঁর জীবনস্পৃহায় আমরাও আরো সজীব হ'য়ে উঠতুম তাঁর কাছে এলে।

তাহ'লে তা-ই হলো। আমি—যদিও যুবকমাত্র—আমি দেখতে পেলাম রক্তমাংসের কবিকে আমার সামনে, যেমন তাঁকে ভেবেছিলাম, ঠিক তেমনি। প্রথম দেখাতেই একটা বিষয়ে আমি মনস্থির ক'রে ফেলেছিলাম : এই মানুষটির, আর তাঁর কাব্যের, আমি সেবা করবো। এই সিদ্ধান্তে তখন কিছু সাহসের প্রয়োজন হয়েছিলো, কেননা ইওরোপের বন্দনা যিনি গেয়েছিলেন ইওরোপ তখনো তাঁকে চেনেনি। আর এও জানতুম যে তাঁর তিনটি নাটক আর বিরাট কাব্যগ্রন্থ আমার নিজের কাজ থেকে দু-তিন বছর সময় হরণ করবে। কিন্তু আমার সময়, উদ্যম, আবেগ একান্তভাবে কোনো বিদেশী কাব্যের অনুবাদে উৎসর্গ করবো, এই প্রতিজ্ঞায় আমার নিজেরই উপকার হয়েছিলো সবচেয়ে বেশি। কাজের মধ্যে নৈতিক দায়িত্ব এলে মানুষকে তা রক্ষা করে। আমার সব অস্পষ্ট সন্ধান, অনিশ্চিত প্রয়াসের মধ্যে এতদিনে যেন একটা অর্থ জেগে উঠলো। আর আজ যদি কোনো তরুণ লেখক, যে এখনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না, আমার কাছে পরামর্শ চায়, আমি তাকে বলবো কোনো সৎগ্রন্থের অনুবাদ-কর্মে হাত দিতে। যার প্রয়াস নবীন, সে স্বকীয় সৃষ্টির চাইতে ত্যাগের পরিশ্রমে অনেক বেশি আশ্বাস পাবে, আর যে-কাজ ভক্তিভরে করা হয়েছে সে-কাজ কখনো ব্যর্থ হয় না।

২. রাইনার মারিয়া রিলকে-র পত্রাংশ

[ভেরআরনের মৃত্যুর পরে লেখা। যাঁকে লেখা, তিনি ভেরআরন বিষয়ে নিবন্ধরচনায় নিয়োজিত।]

১২ ডিসেম্বর, ১৯২১

প্রথমে আপনার কবিতার বিষয়ে বলতে চাই : আরম্ভেই বলি তারা আমাকে বিস্ময় আর আনন্দ এনে দিয়েছে। যে-চারটি আমার পড়ার জন্য

পাঠিয়েছেন তার কোনো একটিকে বিশেষ প্রাধান্য দেবার সংগত কারণ দেখি না ; তাদের মনে হয় যেন পরস্পরের পরিপূরক, প্রত্যেকটি ভালো, যথার্থ, কলাকৌশলে বিশুদ্ধ, কোথাও ফাঁকি নেই। আমার সামনে এই যে পাণ্ডুলিপি রয়েছে, তা যদি আমি রাখতে পারি তাহ'লে আবার মাঝে-মাঝে খুলে দেখবো ; কিন্তু ইতিমধ্যেই আমার প্রত্যয় জন্মেছে যে এই প্রথম সুন্দর অনুভাব স্থায়ী হবে। বিশ্বাস করুন, তরুণ কবিরা আমাকে যে-সব লেখা পাঠান তার বিষয়ে এই রকম অনুমোদনে আমার সম্মতি অতি বিরল : একবার তার ব্যতিক্রম সম্ভব হ'লো ব'লেই আরো বেশি সুখের কথা। আরো বেশি "মনোমুগ্ধকর", ভেরআরন হ'লে লিখতেন। কেননা, যেখানেই কোনো সার্থকতা দেখতে পেতেন সেখানেই মুগ্ধ হতেন তিনি ; তাঁর আনন্দের অভিজ্ঞতা যার ঘটেছে সে সেটা ভুলতে পারবে না ; কোনো তরুণ শিল্পীর আত্মা যেখানেই স্ফূর্ত হ'য়ে তাঁর বিশ্বাস জাগিয়েছে, সেখানেই প্রত্যেকটি বিশুদ্ধ, সুদৃঢ় পংক্তিতে তাঁর উল্লাস অবাধ হ'য়ে উঠতো ; আর সেই অটল, নিঃশর্ত অভিনন্দন তিনি প্রকাশ করতেন তাঁর দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে, তাঁর চৈতন্য, তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে। এ থেকেই বুঝতে পারবেন তাঁর আস্থার, তাঁর উৎসাহের মূল্য ছিলো কতখানি। চরম পরিমাণে ছুটোই লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছিলো আমার, তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের বছরগুলি ভ'রে। যদিও আমার ভাষা তাঁর কাছে ছিলো নিষিদ্ধ গ্রন্থ, আর আমার কোনো রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয়েরও সম্ভাবনা ছিলো না, তবু তিনি আমার ক্ষমতায় বিশ্বাস রেখেছিলেন, আমাকে দিয়েছিলেন তাঁর বলীয়ান প্রকৃতির সমগ্র সমর্থন। আর এইটেকেই আমি বলবো অমূল্য, এই-যে স্পর্শসহ প্রমাণের অভাব সত্ত্বেও, আমাদের মধ্যে অনির্বচনীয়ের ব্যবধান সত্ত্বেও, তিনি আমার রচনাকে সত্য ব'লে, প্রয়োজনীয় ব'লে স্বীকার করেছিলেন—আর সেইভাবেই প্রথম থেকে ব্যবহার করেছিলেন আমাকে। আমি যে আমার অভিপ্রায়কে সবল ক'রে তুলতে পেরেছিলাম, সেজন্য এই বন্ধুর কাছে আমি অনেকাংশে ঋণী ; এই যোগাযোগ আরো বেশি সফল হয়েছিলো এই কারণে যে অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের পূর্বে আমি

কোনো পুরুষের বন্ধুতা পাইনি। তাঁর এবং রোদ্যাঁর বন্ধুতার প্রভাব আমার উপর অসীম, এই দু-জনের সংসর্গের বারিধারা আমার মধ্যে যে-রকমভাবে কাজ ক'রে গেছে তাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

ভেরআরনের প্রতি আমার অনুরাগের সূত্রপাত তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার অনেক আগে—আমার প্রথম (প্রায় বারো-বছর-ব্যাপী) প্যারিস-বাসের সময়ে তাঁর প্রথম পর্যায়ের গ্রন্থাবলী, বিশেষত *Villes tentaculaires* আমাকে অনুক্ষণ অভিভূত ক'রে রেখেছে। তিনি নিজের হাতে প্রথম আমাকে যে-বইটি দিয়েছিলেন সেটি *Multiple Splendeur* ; আমিও প্রস্তুত ছিলাম পূর্ণ হৃদয়ে সেটি গ্রহণ করতে। সেই সময় থেকে মাঝে-মাঝেই তাঁর সঙ্গে দেখা হ'তো, কিন্তু (তাঁর বিচ্ছেদের নিষ্ঠুরতার পরিমাপে) সে-দেখা কতটুকুই বা। প্যারিসের বাইরে সাঁ-ক্লুতে থাকতেন তিনি—প্রত্যেক বছর শুধু শীতের ক-মাস ; কখনো, শহরের মধ্যে হাঁটতে-হাঁটতে আমার পাড়ায় যখন এসে পড়েছেন, অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত হতেন আমার কাছে (আর আমার পক্ষে তাঁর আসার সময় মানেই ঠিক সময় !)—আর তাঁর হৃদয়ের আশ্চর্য আন্দোলন ঝড়ের মতো এগিয়ে আসতো আমার দিকে। আবার কোনো সময়ে আমি (যার প্যারিসের জীবন সর্বদাই ছিলো নির্জনতম) হঠাৎ কোনো ঝোঁকে বেরিয়ে গিয়ে তাঁর পরিমিত কিন্তু সৌহার্দ্যময় ফ্ল্যাটের সেকেলে ঘুন্টি-দড়ি ধ'রে টান দিয়েছি। আর যে-মুহূর্তে চৌকাঠ পেরোনো সে-মুহূর্তে আগন্তুক হ'য়ে যেতো অতিথি—জেগে উঠতো আগত-সম্ভাষণের বিরাট ঐতিহ্য ; তাঁর অভ্যর্থনা এতই বৃহৎ, এতই উন্মুক্ত ও পূর্ণ যে—অন্তত সেই বিশাল আতিথেয়তার সমতারক্ষার জন্যই—আপনাকে হ'তে হ'তো মহান অতিথি, দূরাগত অতিথি, অতিথি অবতীর্ণ—সকল অতিথির মধ্যে অনন্য অতিথি।

কিন্তু আর না।

ভেরআরনের কাব্যের মধ্যে নিজেকে আপনি গভীরভাবে মগ্ন করেছেন ; তাই, তাঁর পরিশ্রমী জর্মন অনুবাদক স্তেফান ৎসোয়াইগ যে-গ্রন্থটিতে কবির

চরিত্র ও তাঁর সঙ্গে নিজের সংশ্রবের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, সেটি হয়তো আপনার অপরিচিত নয়। দুর্ভাগ্যত, বইখানা ঠিক এই মুহূর্তে আমার পক্ষে অপ্রাপ্য—কিন্তু হয়তো মসিয় ত্ত পঁশভীর ছোট্ট বইটি এখনো আপনি দেখেননি—সেটি এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি (যথাসময়ে প্রত্যর্পণ করার অনুরোধ জানিয়ে)। শেষ বইটিতে যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খলা অনিবার্যত প্রবেশ করেছে, আর এটি যখন লেখা হয়েছিলো তার আগেই সেই ভয়ংকর ঘটে গেছে: ভেরআরনের মৃত্যু।

ভেরআরনের কবিতা

'কয়েকটি স্বচ্ছ ক্ষণ' : ১

আশ্চর্য এই আমাদের আনন্দ রেশমের হাওয়ায় হাওয়ায় সোনা বোনে—
এই আমাদের ছোট্ট বাড়িটি, ছোট্ট তার ছাদ, এই আমাদের বাগান ফুল ও ফলের।

আর এই আমাদের আসন আপেল গাছের তলায়, যেখানে শাদা বসন্ত পাতা ঝরায়—নরম পাপড়ির বসন্ত, তার অস্ফুট মৃদু হাত!

আর এই পায়রার ঝাঁক, আমাদের আশা-বেদনারই মতো, আলোর পরশ পেয়ে ওড়ে নিসর্গ-নীলায়।

শিথিল নীলিমার মুখ থেকে ঝ'রে প'ড়ে গেছে যত চুম্বন, তার দুটি যেন এই নীল সরোবর—নিরাভরণ, পবিত্র! অনিচ্ছ আবেগে ফোটা গেঁয়ো ফুলের দল ভিড় করেছে তার চারপাশে।

আশ্চর্য আমাদের আনন্দ, আশ্চর্য আমরা এই বাগানে আজ যেখানে এসে আমরা অন্যের ছায়া।

'কয়েকটি স্বচ্ছ ক্ষণ' : ১৭

আমরা যদি ভালোবাসতে চাই চোখ,
আমাদের চোখ ধুয়ে দিতে হবে
তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে
যাদের হাজারে হাজারে দেখে বেড়াই
এই আমরাই
অসহ্য জীবনের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলে।

ভোর জাগে ফুলে আর শিশিরে—
সুমিষ্ট আলোর রশ্মি;
হয়তো দেখতে পাব এই কুয়াশায়
নরম নরম পালক
কত সূর্যের কত রুপোর কত সূর্যের—
বাগানে গিয়ে হাত বুলোব শৈবালের ওপর।
সুনীল সুন্দর সরোবরে
কাঁপবে ঝলকিত সোনার টুকরো;

পান্না লুঠ ক'রে নেবে গাছের ছায়া—
আর আলো, এক আশ্চর্য আলো
সমস্ত পথ-গুল্ম-তৃণ উপচিয়ে ফেলে
ঝেঁটিয়ে বের ক'রে দেবে ঐ স্যাঁৎসেঁতে ভস্মকণা
যা নিয়ে এখনো মেতে রয়েছে প্রদোষ।

'বিকেলের কয়েকটি ক্ষণ' : ২৪

আমার দিন ঘনিয়ে এলে পর, জানি না হয়তো শুধু একটুখানির তরে, শিথিল কম্পিত কোনো সূর্য ঝুঁকে দেখবে আমার জানলায়।

আমার হাত, আমার দুটি রিক্ত হাত ততদিনে বিবর্ণ হ'লেও সেই ক্ষণিকের
করুণায় হবে আবার স্বর্ণময় ;

ধীরে সে চুম্বন করবে শেষবার আমার মুখে, কপোলে, তার প্রশান্ত গম্ভীর চুম্বন—
আর আমার চোখের ফুলগুলি, পাণ্ডুর হ'য়েও গর্বিত, তাকে ফিরে দেবে তাদের
শেষের কণিকা।

হে সূর্য, তোমার বীর্য তোমার জ্যোতি ধারণ করেছি কি ? আমার প্রয়াস
কখনো রুদ্র, কখনো স্নিগ্ধ, তবু আমরণ পরম ইঙ্গিতে তোমাকে করেছে বন্দী
আমার কবিতায়। গ্রাম্য যেমন হু হু ক'রে হাওয়া ওড়ায় পাকা শস্যখেতে,
আমার লেখা পাতায় পাতায় তেমনি বাঁচো তুমি, তেমনি ক'রে কাঁপো আমার
অক্ষরে অক্ষরে !

যে-তুমি মুক্তি দাও, যে-তুমি জন্ম দাও, যে-তুমি পরম বন্ধু অহংকারেরই ধন,
এসো এই ভীষণ সময়ে, এই পরম নতুনের পরে, যখন আমার জীর্ণ হৃদয়
শেষ পরীক্ষার ভারে কেবলি ভারি হয়—আরো একটুর জন্যে
তুমি থাকো তার বন্ধু, তার সঙ্গী।

অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য

ফ্রস্ট

সন্ধ্যা, বিশাল এক আকাশ, নির্মেঘ, নির্বন্ধক, অলৌকিক,
নক্ষত্রে তুহিন, অন্তহীন, মানুষের প্রার্থনার
অপ্রাপণীয়—আজ সন্ধ্যায় বিশাল এই আকাশ দেখা দিলো।
তার মুকুরে ধরা পড়লো দৃশ্যমান চিরন্তন।

বাঁধলো তার আলিঙ্গনে সোনায় জ্বলা রুপোয় গলা দিগন্তকে
ঝোঁটা-ঝোঁটা বরফ, কঠিন, আঁকড়ে ধরলো বাতাস, স্তব্ধতা, সৈকত

আর প্রান্তর—প্রান্তর অপরিমাণ। বরফের দংশনে
নীল হ'য়ে গেলো দূরত্ব, যেখানে গির্জের চূড়ো বর্শা তুলেছে উঁচুতে

শব্দহীন বন, শব্দহীন সমুদ্র, এই বিশাল আকাশ নিস্তব্ধ।
কেমন তার গতিহীন মর্মভেদী দীপ্তি !
মৌলিক এই শৃঙ্খলা, তীক্ষ্ণ দন্তিল তুষারের এই জগৎ,
আর পরিবর্তন নেই—কিছুতেই, কিছুতেই না।

অবিকল, পরম, অবর্তনীয়। মনে হয় যেন লোহা
আর ইস্পাত আমার চাতুরীহীন বেদনাময় হৃদয়টাকে নিংড়ে নিলো ;
আর আতঙ্ক তাকে বিঁধে ফেললো মৃত্যুহীন শীতে
আর কোনো ঠাণ্ডা, মহান, আকস্মিক, জ্যোতির্ময়, ঈশ্বরে।

গয়লানি

গলায় বাঁধা রুমাল, ঘাগরা ঝুলছে ঢিলে,
ভোরবেলা অনেক দূর থেকে এসেছে এই ঘাসের জমিতে,
কিন্তু ঘুমের ঘোর কাটেনি এখনো, শুয়ে পড়েছে আবার
এক কোণে, গাছের তলায়, চুপচাপ।

মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়লো তক্ষুনি, হাঁ খোলা, নাক ডাকছে,
তার খোলা পা আর কপাল ঘিরে গজিয়ে উঠছে ঘাস ;
বাহু দুটি হেলাফেলায় ভাঁজ করা,
হাওয়ায় ভনভন করে মাছি।

যত সব ঘাস-পোকা, কোমল তাপ আর কবোষ্ণ মাটি যারা
ভালোবাসে,
তারা বেরিয়ে এলো আস্তে-আস্তে, ঝাঁকে ঝাঁকে,
জড়ো হ'লো আদরে সেই শ্যাওলার বিছানায়, যাতে ঐ
মেয়েটার দেহের তাপ ধীরে পড়ছে চুঁইয়ে।

মাঝে-মাঝে, নিজে না-জেনে, ন'ড়ে উঠছে অশোভন ভঙ্গিতে,
জাগিয়ে তুলছে তার চারদিকে মৌমাছিদের
বেশামাল হল্লা ; কিন্তু একটু পরেই, ঘুমের লোভে বিহ্বল
পাশ ফিরে তলিয়ে যায় আবার।

এই ঘাসের জমি, তার মাংসল উদ্ভিদের ভারে
যেমন ঘিরে আছে, ফ্রেমের মতো, নিদ্রাতুরাকে,
তেমনি তার শরীর যেন বলদগুলোর মন্থরতায় অলস,
চোখে জ্বলছে পশুর মতো শান্তি।

সোমত্ত মেয়ে, রক্ত তার শরীর ভ'রে সেই তেজে ফেটে পড়ছে,
যা ওকগাছের ডালগুলোকে গাঁটে-গাঁটে ফুলিয়ে তোলে :
রঙ তার চুল, সমতলের যবের চেয়েও পাণ্ডুর,
বালুর চেয়েও হালকা।

মোটা, লাল, কর্কশ তার হাত ; তীব্র তার প্রাণরস
আগুনের ঢেউ তুলে অঙ্গে-অঙ্গে ছড়িয়ে প'ড়ে
স্পন্দন তোলে বুকে, ফুলিয়ে তোলে স্তন, আস্তে তুলে ধরে,
যেমন গমের খেতে বেগ আনে বাতাস।

দুপুর, একটি সোনালি চুম্বনে, তাকে অবাক ক'রে দেয়—
আর সে এখনো ঘুমুচ্ছে, ভারি চোখে, উইলো গাছের তলায়,
এদিকে খড়কুটো ঝ'রে-ঝ'রে পড়ছে তার গায়ে,
মিশে যাচ্ছে চুলের মধ্যে, অবিরল।

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিশ্বভারতী তাঁদের লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালায় সম্প্রতি একটি মূল্যবান সংযোজন করেছেন : রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক প্রবন্ধসমূহ 'ইতিহাস' নাম দিয়ে সংকলিত হয়েছে। এর কোনো-কোনো রচনা ইতিপূর্বে অন্যান্য গ্রন্থের অন্তর্গত ছিলো, কিন্তু অধিকাংশই লুপ্ত এবং দুষ্প্রাপ্য পুরাতন সাময়িক পত্র থেকে উদ্ধৃত—এ-যুগের পাঠকের পক্ষে একেবারেই নূতন। অবশ্য 'ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের ধারা' এবং তার পরিবর্ধিত ইংরেজি অনুবাদের ('A Vision of India's History') সঙ্গে শিক্ষিত পাঠকমাত্রেই পরিচিত আছেন ; সেখানে যে-সব মূল ধারণা লিপিবদ্ধ আছে, এই গ্রন্থের অন্যান্য রচনাকে তারই সচিত্র উদাহরণ বলা যায়। সহজে, অল্প কথায়, অব্যবহিত রূপে, কোনো বিষয়ের মর্মস্থলে পৌঁছবার জন্য রবীন্দ্রনাথের মতো কাণ্ডারী আর নেই : কথা আরম্ভ করার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রসঙ্গের হৃৎপিণ্ডে চ'লে যান তিনি, একটি ফ্রেমে বাঁধাই সামঞ্জস্যের ছবি তুলে ধরেন আমাদের চোখের সামনে। সেইজন্যই—সাধারণ পাঠকের পক্ষে—তিনি পরম শিক্ষক ; এবং যে-কালে লোকশিক্ষা ভারতভূমিতে ব্যাপ্ত হ'তে চলেছে, সকল বিষয়েই তাঁর পরামর্শ অপরিহার্য। ভারতবর্ষীয় ইতিহাস বিষয়ে তাঁরই ব্যবহৃত 'vision' শব্দটি তাঁর রচনার সার্থকতম বর্ণনা : তিনি যা দিয়েছেন, দিতে পারেন (হয়তো একমাত্র তিনিই পারেন) তাকে দৃষ্টি ভিন্ন কিছুই বলা যায় না : দেখবার চোখ এবং দ্রষ্টব্য বস্তু দুটোই তাঁর উপহার। এই গ্রন্থটির মধ্যে অতীতের ভারত এবং চিরন্তন ভারত জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে : তার দিকে তাকিয়ে বর্তমানকেও আমরা বুঝতে পারি, এবং ভবিষ্যৎকেও অনুমান করা সম্ভব হয়। মানুষের জন্ম সম্পূর্ণ দৈবাধীন, এবং দৈবাৎ এই ভূলোকের যে-অংশে নিক্ষিপ্ত হয়েছি, তার চারদিকেই মহত্ত্ব দেখতে পাওয়াটা ছেলেমানুষি, আর এই ছেলেমানুষিকেই সাধারণত 'দেশপ্রেম' বলা হ'য়ে থাকে। কিন্তু ভারতের কথা রবীন্দ্রনাথের মুখে যখন শুনি, কিংবা যখন 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' কবিতাটিতে ভারতীয় ভূগোল ও ইতিহাসের

ছন্দোবদ্ধ সংহত মূর্তি হাজার বারের বার স্মরণ করি, তখন পাপিষ্ঠেরও রোমাঞ্চিত না-হ'য়ে উপায় থাকে না।

* * *

গেলো বছরে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য' গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণও উল্লেখযোগ্য, কেননা এতে এগারোটি নূতন প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে, 'গ্রন্থ-পরিচয়' অংশও মূল্যবান। এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি কবির মধ্যবয়সের রচনা, অনেক স্থলে কোনো পত্রিকা বা সভার জন্য স্পষ্টত সত্বরভাবে লেখা : এতদিনে বাংলা সাহিত্যের অবস্থাও অনেক বদলে গেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্বভাব ছিলো সাময়িক প্রসঙ্গেও মূল সূত্রের আলোচনা করা : তাই এই রচনাগুলি বাঙালি লেখকের পক্ষে নিরন্তর মূল্যবান থাকবে। 'পাঠকের' বদলে 'লেখক' কথাটা ইচ্ছে ক'রেই বসালাম ; কেননা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দুর্ভাগ্য এই যে যাঁরা লেখক ব'লে পরিচিত তাঁরা সহজে পাঠক হ'তে রাজি হন না—বিশেষত কাব্যের বা প্রবন্ধের।

* * *

সম্প্রতি বাংলা পুস্তকের কাটতি যেমন বেড়েছে, ঠিক তেমনি নিস্তেজ হ'য়ে আসছে সাহিত্য-পত্রিকার অবস্থা। 'চতুরঙ্গ', অনিয়মিত হ'লেও, তার সুদৃশ্য, পরিপুষ্ট আকার বজায় রেখে চলেছে, কিন্তু 'পূর্বাশা'র প্রকাশ স্থগিত রাখতে হ'লো, 'সাহিত্যপত্র'ও বিরলদর্শন। 'উত্তরসূরী' ও তরুণতরদের কবিতা-পত্রের কাকলি এখনো একটি নতুন বসন্তে পরিণত হয়নি। অথচ, যদি বইয়ের কাটতি দিয়ে বিচার করতে হয়, এই সময়েই এই ধরনের পত্রিকার প্রচার বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিলো। তা যে হচ্ছে না তাতে হয়তো প্রমাণ হয় যে প্রচার বাড়লেও রুচির বিকার ঘটেছে— আসল ভোজটাকে উপেক্ষা ক'রে চাটনির জন্যই সকলের লালসা। এই অবস্থার মধ্যে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেনের সম্পাদনায় 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র পুনঃপ্রকাশ উৎসাহজনক। প্রথম সংখ্যাটি দেখে মনে হ'লো—শুধু চেহারায় নয়, চরিত্রেও কোনো বদল হয়নি : পত্রিকাটি মোটের উপর শান্তি-নিকেতনেরই মুখপত্র হ'য়ে আছে। শান্তিনিকেতনের কাছে আধুনিক বাংলা

সংস্কৃতি বহুলভাবে ঋণী, কিন্তু তার প্রধান পুরুষের নূতন রচনা যখন আর পাওয়া যাবে না, অপ্রকাশিত রচনার মধ্যেও চমকপ্রদ আবিষ্কারের সম্ভাবনা কম, তখন শুধু (বা প্রধানত) তার উপর নির্ভর ক'রে পত্রিকা সপ্রাণ হ'য়ে উঠবে কিন, সে-কথাটি চিন্তনীয়। আমরা আশা করবো নূতন সম্পাদক নূতন কালের বাংলা সাহিত্য ও শিল্পকলার সঙ্গে যোগস্থাপন করবেন, উপরন্তু বিশ্বসাহিত্যের প্রসঙ্গেও উদাসীন থাকবেন না। 'বিশ্বভারতী' নামের যা আক্ষরিক অর্থ, আমরা এই পত্রিকাটিকে তারই দর্পণ-রূপে দেখতে চাই।

* * *

রবীন্দ্র-স্মৃতি-পুরস্কার বিষয়ে পশ্চিম বঙ্গ সরকার যে-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন, সাহিত্য এবং সাহিত্যিকের পক্ষে তার চাইতে অপমানজনক কোনো দলিল আমাদের চোখে পড়েনি। লেখকদের এর জন্য 'প্রার্থী' হ'তে হবে : পাব্লিক সার্ভিস কমিশনে চাকুরির আবেদনপত্রের মতো জীবনীপঞ্জী লিখে দিতে হবে (জন্মের তারিখ, বিদ্যালয়াদির নাম সুদ্ধ)—শুধু তা-ই নয়, দু-জন 'সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক বা সাহিত্যিকে'র সুপারিশ-পত্র সঙ্গে না-থাকলে সেই 'আবেদন বিবেচিত হবে না'। বারো কপি পুস্তকও প্রেরিতব্য। বলা বাহুল্য, 'পুরস্কার' আর 'আবেদন' পরস্পর-বিরোধী শব্দ : যাকে পুরস্কার বলা হচ্ছে তার মধ্যে কোনো গুণপনা বা সৎকর্মের জন্য সম্মাননার ভাবটাই প্রধান, সেই সম্মান যথা-স্থানে অর্পণ করাতেই দাতার গৌরব, এবং তা যদি সম্পূর্ণরূপে অযাচিত না হয়, যদি প্রাপক তার জন্য কখনো একটি কড়ে আঙুলও নাড়েন—তাহ'লেই সমস্ত জিনিশটা এক দিকে হ'য়ে ওঠে ভিক্ষাবৃত্তি, অন্য দিকে ঔদ্ধত্য। লেখকের জীবনী-তথ্য, এমনকি তিনি জীবিত বা মৃত, এই সব প্রশ্নই অবান্তর : শুধু পূর্ব-বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত পুস্তক হওয়া চাই, এই শর্তটিও নিতান্ত অর্থহীন। আর তাছাড়া একটি পুস্তকই বা হ'তে হবে কেন ; কোনো-কোনো ক্ষেত্রে লেখকের সমগ্র রচনাকেই অভিনন্দন জানাবার প্রয়োজন ঘটতে পারে—তা থেকে একটি গ্রন্থকে বিচ্ছিন্ন করতে গেলে মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়। এই রকম ছিদ্রবহুল বিজ্ঞপ্তি যে প্রকাশিত হ'তে পারলো, আর তা নিয়ে কোনো

আন্দোলনও হ'লো না, এতেই বোঝা যায় আমরা এখনো সভ্য জগতের বহুদূরবর্তী কোন মরুভূমিতে বাস করছি। অন্তত, সাহিত্যিকরা এর নিঃশব্দ এবং ফলপ্রসূ প্রতিবাদ জানাতে পারেন অসহযোগ পন্থা অবলম্বন ক'রে; কিন্তু হয়তো এতদিনে বহু আবেদন-পত্র যথোচিত সুপারিশ এবং বারো কপি ক'রে পুস্তক-সমেত যথাস্থানে পৌঁছে গেছে, আর আগামী বৎসরেও এই লজ্জাকর লিপি পুনরায় রাষ্ট্র করা হবে। এই বুভুক্ষাময় দেশে সাহিত্যিকের মধ্যেও আত্মসম্মান-বোধ দুষ্প্রাপ্য।

চিঠিপত্র

'কবিতা'-সম্পাদক সমীপেষু

'কবিতা'-র আষাঢ় সংখ্যায় (১৩৬২) শ্রীযুক্ত নরেশ গুহ 'পারাপার'-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে স্বরবৃত্তের ব্যবহার নিয়ে তর্ক উত্থাপন করেছেন। তাঁর অভিযোগ, গ্রাম্য ছড়ার ছন্দই স্বরবৃত্ত এ-কথা মেনে নিয়েও ছন্দঃশাস্ত্রীদের কেউ-কেউ বলছেন যে এ-ছন্দের পর্বে পর্বে চারমাত্রার কড়া আইন শিথিল হলেই জাত যাবে। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি, গ্রাম্য ছড়ার পর্বে পর্বে চারমাত্রার বিন্যাস যে সর্বত্র মানা হয়েছে এমন নজির নেই—চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্ব অনেক ছড়াতেই সসম্মানে উপস্থিত। এর উদাহরণ হিসেবে শ্রীযুক্ত নরেশ গুহ যে জনশ্রুত পঙ্‌ক্তিটির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তা এই: 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান'—তিনি বলেছেন, 'নদেয় এলো' পর্বটির ধ্বনিমূল্য চারমাত্রার বেশি। এই প্রসঙ্গে আমার কিছু বক্তব্য আছে। 'নদেয় এলো' চারমাত্রা-ছড়ানো পর্ব, এই অভিমত অমান্য, যেহেতু ছড়ার ছন্দের উচ্চারণভঙ্গি অনুসারে 'নদেয়'-এর 'দেয়' এক-মাত্রিক—হসন্তবর্ণ ব'লে 'য়' এখানে দাড়াবার জায়গা পায় না, 'দে' ঈষৎ দীর্ঘ উচ্চারিত হয় মাত্র; ছড়ার ছন্দ আমরা যে-ভঙ্গিতে আবৃত্তি করি তাতে দীর্ঘ অক্ষরের (long syllable) ওজন একমাত্রায় নেমে আসে। এ-কথা যদি জানা থাকে তাহলে 'নদেয়

এলো'-কে চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্ব বলবো কেন? 'নদেয় এলো'-র পরিবর্তে 'নদীতে এলো' থাকলে পর্বটিকে চারমাত্রা-ছাড়ানো বলতাম। 'বেরিয়ে এলেই' ('পারাপার'-এর সমালোচনায় উদ্ধৃত) পর্বটি সম্পর্কেও সেই কথা। 'রিয়ে' আর 'নেই' দৃশ্যত যা-ই হোক, উচ্চারণের দিক থেকে যৌগিক স্বরবর্ণের মতো ('ইএ' আর 'এই'-র সমতুল্য), তাই ছড়ার ছন্দের বিশেষ উচ্চারণ-ভঙ্গির প্রভাবে ওরা সংশ্লিষ্ট হয়ে সহজেই একমাত্রায় পরিণত হয় এই কারণেই 'বেরিয়ে' 'ছড়িয়ে' 'পাপিয়া' জাতীয় শব্দগুলির দ্বৈমাত্রিক প্রয়োগই ছড়ার ছন্দে (স্বরবৃত্তে) সচরাচর দেখা যায়। আমার বক্তব্য অবশ্য এই নয় যে চলতি ছড়ায় চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্বের ব্যবহার নেই। কথা হ'লো, স্বরবৃত্তে চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্ব ব্যবহার করা সম্ভব কিনা। বাঙলা ছন্দের—বিশেষ ক'রে স্বরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের—সৌষম্যের ভিত্তিই হলো পর্ব-উচ্চারণের কালগত ঐক্য। তা যদি সত্য হয়, স্বরবৃত্তে (চতুর্মাত্রিক) চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্ব সংযোজিত হ'লে ছন্দ ব্যাহত হবেই। এখন প্রশ্ন হ'লো, গ্রাম্য ছড়ার ছন্দে যে চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্ব দেখতে পাওয়া যায় তার ব্যাখ্যা কী হ'তে পারে? এর উত্তর খুবই সহজ: চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্ব যাকে মনে হচ্ছে, হয় সেটা আসলে চতুর্মাত্রিক পর্ব, নয় সেখানে ছন্দ খণ্ডিত হচ্ছে। উদাহরণত, 'যমুনাবতী সরস্বতী···' ছড়াটির উল্লেখ করি। 'যমুনাবতী' স্পষ্টতই চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্ব, অথচ কানে ঠেকে না; এর কারণ এই ছড়াতে 'যমুনাবতী'-কে একটা বিশেষ ভঙ্গিতে আমরা উচ্চারণ ক'রে থাকি, যার ফলে 'যমুনাবতী'-কে অনেকটা 'যোমনাবতী'-র মতো শোনায়, বংশপরম্পরায় মা-ঠাকুমাদের কাছ থেকে আমরা এই রকম উচ্চারণ শুনে আসছি, তাই অভ্যাস-বশত যখন আবৃত্তি করি তখন লক্ষ্য করি না। লোকের স্বাভাবিক শ্রুতিবোধ ছড়াটির ছন্দ-দুষ্টতা শুধরে নিয়েছে; এবং ঠিক এই ভাবেই 'কুড়তে'-র মতো পর্বকেও বিছিয়ে দিয়েছে চার মাত্রায়। যদি কেউ বলেন, 'যমুনাবতী' এবং 'কুড়তে'-কে আমি স্বাভাবিকভাবেই পাঠ করি এবং তাতে কান কোনও আপত্তি করে না, তা হলে তাঁর শ্রুতিবোধ সম্পর্কে আমি সন্দেহ প্রকাশ করবো। এখানে

আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি : 'রাত পোহালো ফরসা হ'লো ফুটলো কত ফুল। কাঁপিয়ে পাখা নীল পতাকা জুটলো অলিকুল। গাছের ডালে পালে পালে ডাকছে কত কাক। পূজা বাটিতে জোর কাঠিতে বাজছে যেন ঢাক। ...ইত্যাদি, এই কবিতাটি যতবার ছোটোবেলায় আবৃত্তি করেছি, ততবারই 'পূজা বাটিতে' পর্বটিতে হোঁচট খেয়েছি—কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতাম। বড়ো হ'য়ে এর কারণ বুঝতে পেরেছি। প্রচলিত ছড়ার নজির দেখিয়ে কোনো আধুনিক কবি যদি চতুর্মাত্রিক স্বরবৃত্তে 'যমুনাবতী' কিংবা 'কুড়তে'-র মতো পর্ব ব্যবহার করেন, তাহ'লে তিনি পাঠকদের উপর সুবিচার করবেন না। তখন প্রশ্ন উঠবে, শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় যে চার-মাত্রা-ছাড়ানো পর্ব দেখা যায় সেগুলো কানের সম্মতি পায় কী ক'রে। এই ধরনের কবিতাগুলো প্রকৃতপক্ষে স্বারবৃত্তে লেখা কিনা সে-সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। স্বরবৃত্তের ভঙ্গিতে পাঠ করলে এই সব চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্বে এসে যে থমকে দাঁড়াতে হয় সেটা সবিনয়ে স্বীকার ক'রে নেওয়া ভালো। এ-জাতীয় কবিতার আবৃত্তির ভঙ্গি স্বতন্ত্র, অতএব এদের ছন্দও স্বতন্ত্র—এরা ঠিক স্বরবৃত্তও নয়, আবার মাত্রাবৃত্তও (যে-ছন্দে দীর্ঘ অক্ষর সর্বদাই দু মাত্রা) নয়—উভয়ের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়েছে যেন এ-ছন্দে—এর ব্যাকরণ আপাতত তৈরি করা সম্ভব না হ'লেও এ-নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। বাংলা কবিতার ছন্দ আর রূপের বৈচিত্র্যসাধনের জন্য যে-কজন কবি চিন্তা করেন, শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট। স্বরবৃত্তে চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্ব কৌশলে ব্যবহার ক'রে তিনি যে নতুন এক ধ্বনিস্পন্দনের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, এটা তাঁর বিস্ময়কর শ্রুতিবোধের পরিচয়। এই সূত্রে তাঁর পদ্য-ছন্দের আভাসযুক্ত গদ্য কবিতার কথা উল্লেখ করি।

'ছড়ার ছন্দই স্বরবৃত্ত', এ-কথাটাও বোধ হয় ঠিক নয়, যেমন ঠিক নয় কৃত্তিবাস রচিত পয়ারের (রামায়ণের বটতলা সংস্করণে যা দেখা যায়) প্রত্যেকটি চরণকে 'আদর্শ পয়ার' আখ্যা দেওয়া। স্বরবৃত্ত ছড়ার ছন্দের সংস্কৃত রূপ—রবীন্দ্রনাথের হাতে পরিমার্জিত হয়ে এ-ছন্দ সাহিত্যের দরবারে প্রবেশাধিকার

পেয়েছে। তাছাড়া, স্বরবৃত্ত নামটাও কোনো কোনো ছান্দসিক গ্রহণযোগ্য ব'লে মনে করেন না, যেহেতু 'স্বর' মাত্রেই এ-ছন্দে একমাত্রা নয়। তিনটে স্বর এমনকি দুটো স্বরও কৌশলে ব্যবহার করতে পারলে এ-ছন্দে চারমাত্রার মর্যাদা পায়—আবার যে-পর্বে দৃশ্যত চারটে স্বর আছে, শ্রুতির দিক দিয়ে তাই কখনো-কখনো চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্বে পরিণত হ'য়ে ছন্দকে বিড়ম্বিত করে। যেমন, [পর্বে] চারটে দীর্ঘ অক্ষরের বিন্যাস এ-ছন্দে চলে না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়লো, চৈত্রের 'কবিতা'-য় (১৩৬১) প্রকাশিত এক সমালোচনাতে শ্রীযুক্ত অরুণকুমার সরকার 'কবিমশাই' কবিতার 'পুরোনো লাইন' পর্বটি সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন। পর্বটিতে দৃশ্যত চারমাত্রাই আছে, 'লাইন' ছড়ার ছন্দে সাধারণত একমাত্রা-ই, আমার মনে হয়, 'লাইন' পর্বাঙ্গটি দাঁড়াবার জায়গা না পাওয়ায় এলিয়ে প'ড়ে মাত্রাধিক্য ঘটিয়েছে ; পর্বটি 'লাইন পুরনো' কিংবা ঐ জাতীয় কিছু হ'লে শ্রীযুক্ত অরুণকুমার সরকারের শ্রুতিবোধ হয়তো আপত্তি করতো না।

কলকাতা

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

লেখকের উত্তর : 'পারাপার' প্রবন্ধে স্বরবৃত্তের চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্বের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে ছড়া থেকে ভুল পংক্তি উদ্ধার করেছিলাম ব'লে লজ্জিত আছি। পত্রলেখকের কাছে ভ্রমনির্দেশের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আসলে 'যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে' কিংবা 'কাজিফুল কুড়োতে গিয়ে পেয়ে গেলুম মালা'—এইরকম কোনো পংক্তির উল্লেখ করাই বর্তমান লেখকের অভিপ্রায় ছিল। এ-ধরনের অনবধানতা নিশ্চয়ই অমার্জনীয়।

চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্বের সমর্থন করতে গিয়েও পত্রলেখক যে যুক্তি দিয়েছেন তা মেনে নিতে আমি অক্ষম। ছন্দজ্ঞানহীন শিশুদের মুখে এ ছড়ার আবৃত্তি আমি শুনেছি। দেখেছি 'যমুনাবতী', 'কুড়োতে গিয়ে' ইত্যাদি

পর্বকে পাঁচমাত্রার পুরো মূল্য দিয়েই তারা সুখ পায় এবং দৃশ্যত এখানে এসে তারা ছন্দের ভিন্ন রকমের দোলাটিকে মজার সঙ্গে উপভোগ করে। 'পূজা বার্ষিকে' পর্বের ভাষাব্যবহার অসহ্য, কিন্তু শিশুদের কাছে এর ছন্দ যে বাধা জন্মায় না সেটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। পাঁচ মাত্রার পর্বকে আমি স্বরবৃত্ত বলিনি। বলেছি স্বরবৃত্তে এ রকমের মিশোল চালানো অপরাধের নয়।

আসলে অমিয় চক্রবর্তীর 'বৈদান্তিক' কবিতাটিকে কেন ঐ প্রবন্ধে স্বরবৃত্তের ছন্দ বলেছিলাম, কেন পরে সে-ধারণা ঈষৎ পরিবর্তন করতে হয়েছে, সে-বিষয়ে নতুন ক'রে দু'কথা যোগ করা প্রয়োজন। 'প্রকাণ্ড বন প্রকাণ্ড গাছ' কিংবা 'সবুজ অন্ধকার', 'বুকের মধ্যে বাড়ি যাবার' ইত্যাদি কিছু-কিছু অংশ ছাড়া এ-কবিতা পাঁচ মাত্রাতেও পড়া যায় এ-কথা আমার কোনো-কোনো বন্ধু আমাকে বলেছিলেন। তাঁদের মতে কবিতাটি পাঁচমাত্রার পর্বেই লেখা, কিছু অংশ স্বরবৃত্তে। কিন্তু 'প্রকাণ্ড বন'-এর মতো 'পাতা পাতায়' 'শাখা শাখায়' 'জোনাকি কীট' 'বুনো আঙুর', 'বিনা চাষের বুনোধানের গুচ্ছে রয়' ইত্যাদি অধিকাংশ পংক্তি পাঁচ মাত্রায় পড়া কি স্বাভাবিক? না এগুলি স্পষ্টতই চার-মাত্রার পর্ব? এখন আমার মনে, হয়, চার আর পাঁচ মাত্রা ছন্দ এ-ভাবে মিশিয়ে অভিনব একটি বাংলা ছন্দের সূত্রপাত হয়েছে এখানে। তাকে বাংলা ফ্রী ভর্স-এর চর্চা বলা চলে কিনা, সে-বিচার আশা করি ছান্দসিকেরা করবেন।

পত্রলেখকের যুক্তি শোনবার পরেও 'বেরিয়ে এলেই'-কে আমি পাঁচ মাত্রার কমে উচ্চারণ করতে অসমর্থ। স্বরবৃত্তে লেখা 'সাবেকি' কবিতায়

দু চার পিপে **জমিয়ে নস্য** হঠাৎ ভোরে **হলো অদৃশ্য**

পংক্তিটি কী-ভাবে পড়ব আমরা?

—নরেশ গুহ

'কবিতা'-সম্পাদক সমীপেষু

'কবিতা'র জীবনানন্দ-স্মৃতি-সংখ্যায় আপনার লেখা 'জীবনানন্দ দাশ' পড়লাম। খুবই চমৎকার লাগল, কিন্তু বিশেষ একটি জায়গায় আপনার সঙ্গে আমি একমত হ'তে পারলুম না। আপনি 'আট বছর আগের একদিন'-এ কবির যে-দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করেছেন আমার কিন্তু মনে হয় না যে সত্যি সত্যি কবির বক্তব্য তা-ই। এ-সম্বন্ধে আমার ধারণাটি নীচে লিখলাম।

আপনার মতে, 'মৃত্যুকে দলিত ক'রে' 'জীবনের গভীর জয়' জীবনানন্দ প্রকাশ করেছেন তাঁর 'আট বছর আগের একদিন'-এ। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। জীবনের প্রচুর ভাঁড়ারে আনন্দে বেঁচে থাকার খোরাক হয়ত যথেষ্ট আছে; নিছক জৈব আকাঙ্ক্ষায় কোথাও কোনো খাদ না থাকলেই অন্যান্য জীবের পক্ষে হয়ত জীবন হয়ে ওঠে চমৎকার, কিন্তু মানুষের পক্ষে তা হয় না। তার কারণ 'আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে আরো এক বিপন্ন বিস্ময়'। তাই প্রকৃতির আনন্দের মায়ায় আর সকলে ভুলে থাকতে পারে, বুদ্ধিজীবী মানুষ পারে না। এমন কি, জীবনের আনন্দের জন্যে অন্যান্য জীবের চেয়ে মানুষের যে আরো বেশি উপকরণের প্রয়োজন, তার সব কিছু পেলেও মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। নারীর হৃদয়, প্রেম, শিশু, গৃহ, অর্থ, কীর্তি, সচ্ছলতা—এত পাওয়ার পরও মানুষের বেদনা থেকে যায়। এই যাকে বলা যেতে পারে দার্শনিক বেদনা, কবি যাকে বলেছেন 'বিপন্ন বিস্ময়' তা ক্রমশই গভীরতর হতে থাকে যতই আমাদের বুদ্ধি জীবনের আপাত-আনন্দের আবরণ ভেদ ক'রে দেখায় আমাদের সীমা ও বিশ্বের বিরাট রহস্য। এই বিপন্নতাবোধ, এই বিস্ময়বোধ, একবার জাগলে বুদ্ধিমান মানুষের মনকে প্রতি-নিয়ত এমনভাবে নাড়া দিয়ে বিধ্বস্ত করতে থাকে যে বাস্তবিকই তা আমাদের 'ক্লান্ত করে, ক্লান্ত—ক্লান্ত করে।'

কিন্তু তাই ব'লে কবি যে এই অপমৃত্যুকে বরদাস্ত করেন, তাও না। সসীম দৃষ্টি এবং শক্তি দিয়ে মানুষ এই বিশ্বের অনন্ত রহস্যের সীমানায় না-পৌঁছতে পারার জন্যে অপার বেদনা, অপরিসীম ক্লান্তি বোধ করতে পারে; কিন্তু তাই

ব'লে অস্বাভাবিক মৃত্যু বরণ ক'রে 'লাসকাটা ঘরে টেবিলের পরে খ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে' চিৎ হয়ে শুয়ে থাকার মধ্যেও কোনো সার্থকতা নেই। তাই কবি প্রশ্ন করেছেন :

জীবনের এই স্বাদ—দূষক ঘরের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকালের—
তোমার অনঙ্গ রোদ হলো।
মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো
মর্গে—ঘুমোটে—
খ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে ?

হৃদয় তবে জুড়োবে কেমন ক'রে ? কবির হৃদয় জুড়িয়েছে কেমন ক'রে ? এর উত্তর, আমার মনে হয়, কবিতাটির সর্বশেষ পংক্তিতে পাওয়া যায় :

'আমরা দুজনে মিলে শুরু করে চলে যাব জীবনের প্রচুর তাঁড়ার।' 'আমরা দুজনে মিলে'—এইখানেই হয়ত রয়েছে কবির ইঙ্গিত। অর্থাৎ জীবনের তাঁড়ারে যে প্রচুর আনন্দ আছে তা যেমন ঘুরঘুরে অন্ধ পেঁচার মতো আমাদের গ্রহণ করা উচিত, কেননা আমরাও জীব, তেমনি উচিত আমাদের বরণ ক'রে নেওয়া জীবনের তাঁড়ারে যে-প্রচুর বৃদ্ধিগত বেদনা এবং ক্লান্তি সঞ্চিত আছে তাকেও, কারণ তাতেই হল মানুষের স্বাক্ষর। তাই একদিকে আমরা দেখি যে অচিকিৎস্য জীবন-ক্লান্তিতেই কবিতাটি শেষ হ'লো না, কিন্তু কবি তাকে অস্বীকারও করছেন না : 'জানি—তবু জানি···আমাদের ক্লান্ত করে—ক্লান্ত—ক্লান্ত করে—' এর মধ্যেকার আকৃতিই প্রমাণ করে কবির উপলব্ধিতে এটা কতখানি সত্য। অন্যদিকে তেমনি কবিতাটির লিখনভঙ্গির সুরে যদিও ফুটে ওঠে প্রাণসত্তার আদিম আনন্দ, তবু প্রগাঢ় পিতামহীর চোখ পাল্টিয়ে প্রচার-করা তুমুল গাঢ় সমাচারই যে মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাচার নয়, তাও খুব স্পষ্ট। সুতরাং কবিতাটিতে আমরা ঠিক জীবনের জয়-পরাজয় পাই না, পাই বোধ হয় জীবনের স্বরূপ।

এলাহাবাদ

প্রকাশচন্দ্র চক্রবর্তী

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু। সহকারী সম্পাদক : নরেশ গুহ। ৮।১ লালবাজার ষ্ট্রীট, কলকাতা, স্বপ্না প্রেসে মুদ্রিত, ও কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।

KAVITA

(*Poetry*)

Yearly Rs. 4/-, or 6s. 6d. or $ 1. 50
Rupee one per copy.
এক টাকা

Published quarterly at Kavitabhavan, 202 Rashbehari Avenue, Calcutta 29, India

Editor & Publisher : BUDDHADEVA BOSE
Assistant Editor : NARESH GUHA

Printed at Swapna Press Ltd., 8/1, Lallbazar Street, Calcutta-1.